প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬৩, এপ্রিল, ১৯৫৬

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

লেজার টাইপসেটিং : পেজমেকার্স
২৩বি, রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ৭০০ ০২৬

মুদ্রক স্বপনকুমার দে, দে'জ অফসেট
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

সূচীপত্র

রস ও রুচি

ইতিহাসের সঙ্গে তত্ত্বের কোথায় যেন প্রকৃতিগত বৈপরীত্য আছে। ইতিহাস কালের ধারাবাহিকতায় তথ্যের বিবরণ আর তত্ত্ব তথ্যের অন্তরালবর্তী অপরিবর্তিত সত্য। কোনো কিছুকে বোঝবার এই দুটি পন্থা, ইতিহাসের পদ্ধতিতে ঘটনা-পরম্পরার সঙ্গে সম্পর্ক নির্ণয় করে যেমন কোনো বস্তুকে জানা যায়, তাত্ত্বিক দিক দিয়ে সামান্য প্রকৃতি উদ্ধার করেও তেমনি তাকে জানা যায়।

সাহিত্য বিচারেও এই দুটি পন্থাকে অনুসৃত হতে দেখি। সাহিত্যের ইতিহাসে আমরা সাহিত্যের যে পরিচয় পাই, তার রস-সমালোচনায় সে পরিচয় সম্পূর্ণ ভিন্ন না হলেও গভীর এবং সূক্ষ্ম। সেই সূক্ষ্মতা দিয়েই নির্ধারিত হয় কোনো সাহিত্যবস্তুর উৎকর্ষ। সাহিত্যের ইতিহাসে অনেক অজ্ঞাত স্বল্পখ্যাত, হারানো বইয়েরও বিবরণ আসন পেয়ে থাকে বিখ্যাত বহুপঠিত সমাদৃত গ্রন্থের সঙ্গে। কিন্তু অকিঞ্চিৎকর বই নিয়েও গবেষণা হয়, এবং সে গবেষণা ইতিহাসের কলেবরও বৃদ্ধি করে, কিন্তু অকিঞ্চিৎকর বইয়ের রসবিচার করে কেউ কালক্ষেপণ করেন বলে জানি না।

ইতিহাস কেন পড়ি—এই প্রশ্নের গতানুগতিক উত্তর দেবার চেষ্টা না করে সাহিত্যের ইতিহাস-জ্ঞান রসোদ্বোধনে কোনো সাহায্য করে কিনা, এ প্রশ্নটারই বরং প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা যেতে পারে। একটা জিনিষ পরিষ্কার যে সাহিত্যের ইতিহাস লেখার বহু পূর্ব থেকেই সাহিত্যের তত্ত্ব আলোচিত হয়ে আসছে। আমাদের দেশে সংস্কৃত সাহিত্যের তো কোনো ইতিহাসই লেখা হয়নি উনিশ শতকের আগে। ইউরোপেও অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে সাহিত্যকে ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের সহযোগী করেই নতুনভাবে দেখা হয়েছে। কিন্তু বহু প্রাচীনকালে যেমন একালেও তেমনি সাহিত্যের নির্বিশেষ তত্ত্ব আলোচনা অব্যাহতভাবেই চলে এসেছে। সুতরাং সাহিত্যভোগের জন্য ইতিহাসের ধারাবাহিক বিবরণের প্রয়োজন নেই বলেই তো মনে হয়। কোনো সাহিত্যবস্তু আস্বাদন করতে পূর্বাপরতা জানারও আবশ্যকতা এমন কিছু আছে কী? সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা কত উৎকৃষ্ট এটা বোঝবার জন্য সুধীন্দ্র-পূর্ববর্তী কাব্য আলোচনাও কী একান্তই দরকার? আমি যদি কাব্যবস্তুনির্মাণ-পদ্ধতি অথবা কাব্য-প্রকাশরীতি জানি, তাহলেই তো আস্বাদনে তা কাজে লাগবার পক্ষে যথেষ্ট। আর অন্যান্য যে-তথ্য, তাতে পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন মেটে, কিংবা কলেজের ক্লাশে ছাত্রদের মুগ্ধ বিস্ময় জাগানো যায় মাত্র, কিন্তু কাব্যরসানুভূতির পক্ষে তা অনাবশ্যক।

এই যুক্তি যদি মেনেও নেওয়া যায় তা হলেই কর্তব্য সুনিশ্চিত হয়ে যায় না। কারণ নিছক রসতত্ত্বও চিরকাল এক জায়গায় স্থির থাকেনি। কাব্যের মধ্যে আমরা রসের কেন্দ্র খুঁজতে গিয়ে কোন আশ্রয় নেব—এরও কী ধ্রুবতা আছে? আমরা

কী এখন আলংকারিক রীতিতে রস-আস্বাদন করি, না মিড্‌লটন মারে অথবা ওয়ালটার পেটারের প্রদর্শিত পথে চলি? ব্রাডলির শেক্সপীয়র আলোচনারীতিও নাকি সেকেলে হয়ে গিয়েছে। সুতরাং রসই বা ঠিক কী, তাও বলা শক্ত। কাব্যোপভোগের সঙ্গে মানব-মনের সম্পর্ক ঠিক কী রকম সে কথা ব্যাখ্যা করে বলা কঠিন। পঞ্চম শতাব্দীর পাঠক কালিদাসের কাব্য পাঠ করলে যে-আনন্দ পেত আমরা বিংশ শতাব্দীতে ঠিক সেই আনন্দই পাই—এ কথা জোর করে বলা যায় না। তাই কাব্যনিহিত রস চিরকালই এক যদি না থাকে তবে রসতত্ত্বের ধ্রুবআদর্শই বা গড়ে উঠতে পারে কি করে। দেখা যাচ্ছে, সাহিত্যে আনন্দ পেতে হলে ইতিহাসবোধ যেমন অত্যাবশ্যক নয়, রসতত্ত্বও তেমন অত্যাবশ্যক নয়। যুগে যুগে যেমন সাহিত্যতত্ত্ব বদলায়, তেমনি ব্যক্তিতে অথবা গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতেও সে-তত্ত্ব বদলাতে পারে।

এমনি করে যখন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীতে রসাস্বাদনের বিভিন্নতা ঘটে, তখন আর তাকে রসের ব্যাপার বলি না, তখন তার নাম দিতে হয় রুচি। একথা কালিদাস জানতেন। রস এবং রুচি কথা দুটির মধ্যে অর্থগত পার্থক্য এমন কিছু নেই। তথাপি ব্যবহারিক পার্থক্য একটা রক্ষা করেই চলতে হয়েছে। স্বয়ম্বরসভায় বহু যোগ্য রমণীমনোহর রাজাকেও প্রত্যাখ্যান করে এগিয়ে গিয়েছেন রাজকন্যা ইন্দুমতী। তাতে কী ইন্দুমতীর গুণগ্রহণক্ষমতার অপটুতা প্রমাণিত হয়, না রাজাদের অযোগ্য উপস্থিতি প্রমাণিত হয়?

নাসৌ ন কাম্যো ন চ বেদ সম্যক্
দ্রষ্টুং ন সা ভিন্নরুচির্হি লোকঃ॥

রাজারাও অযোগ্য ছিলেন না, রাজকন্যাও যে তা জানতেন না তা নয়। বস্তুত লোকের রুচিই ভিন্ন।

এই রুচি কথাটি মারাত্মক ; কেননা এর আর কোনো যুক্তি নেই। সে স্বতন্ত্র ও স্বয়ংনির্ভর। রস যাই থাক রুচির আলাদা হতে কোনো বাধা নেই। সমালোচক বিচার করে দেখালেন কবিতার রসোত্তীর্ণতা, কিন্তু পাঠকবিশেষের রুচি কিছুতেই তাকে গ্রহণ করল না। রস এবং রুচি মূলত অর্থে এক হলেও প্রয়োগ করি ভিন্ন অর্থসমন্বিত করে। রস হচ্ছে সেই জিনিস যা যুগ এবং দেশকে অতিক্রম করে আনন্দস্বরূপ হয়ে ওঠে ; আর রুচি হচ্ছে সেই বস্তু যা যুগে স্থানে অথবা ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ থেকে আনন্দস্বরূপ হয়। অনুরাগ বা প্রীতির অপর নামই রুচি। আবার রস-ও আনন্দ বা প্রীতি ছাড়া কিছু নয়। সংস্কৃত অলংকারে রস বলতে হয়তো বিশেষ কোনো একটি বস্তুকে বোঝায়। আমরা সাহিত্যের আনন্দকেই বলি রস। কিন্তু গভীর সাহিত্য অধ্যয়নে যে আনন্দ পাই—তা যে-কালেই হোক না কেন, সাধারণভাবে তাকেই রস বলা যায়। তাত্ত্বিকরা বলবেন এই রস চিরকালের পাঠকের কাছে অম্লান থাকে।

রুচি সম্বন্ধে এমন কথা বলা যায় না। রস থাকলেও তাতে পাঠকের রুচি না

থাকতেও পারে। বৈষ্ণব পদাবলীতে রস আছে স্বীকার করেও অনেকের তাতে রুচি নেই। মহাভারত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য তবু তার অনুসরণে আজকের লেখকদের রুচি নেই। ভারতচন্দ্র পড়ে অভ্যস্ত বাঙালি পাঠক মেঘনাদবধ কাব্য অনেকদিন সহ্য করতে পারেনি। আবার মেঘনাদবধ কাব্যকে ব্যঙ্গ করে প্রবন্ধ লিখেছেন একালের আধুনিক কবি। এ ঘটনা চিরকালই ঘটে আসছে। এমন কি অতি সাম্প্রতিক কালেও একটি সুপরিচিত পত্রিকায় কর্তৃপক্ষের দুটি প্রস্তাব চোখে পড়ল। একটি প্রস্তাব, রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতা পুরনো হয়ে গিয়েছে, আজকালও পড়তে ভালো লাগে এমন কবিতা আবার বাছাই করে একটি সংকলন প্রকাশ করা উচিত। দ্বিতীয় প্রস্তাব, সুধীন্দ্রনাথের কবিতাও সব পড়া যায় না। তারও কিছু নির্বাচন হওয়া দরকার। এই প্রস্তাব দুটির ঔচিত্য নিয়ে প্রশ্ন করব না। একথাও বুঝতে অসুবিধা নেই যে লেখক রবীন্দ্রনাথ বা সুধীন্দ্রনাথ কারোরই অন্ধ ভক্ত নন। কিন্তু প্রস্তাব দুটি দেখে স্বভাবতই সাহিত্য-উপভোগ সম্বন্ধে মনে নানা চিন্তার উদয় হয়। সাহিত্যের ইতিহাস ও পটভূমি বিশ্লেষণকে উপেক্ষা করেছিলেন যে-সব সাহিত্য-তাত্ত্বিক, তাঁরা নিজেরাই কম অনিশ্চয়তার মধ্যে নেই। তত্ত্ব দিয়ে রবীন্দ্রকাব্যের উৎকর্ষ নির্ণয়ে শ্রান্তি ছিল না, তবু রবীন্দ্রকাব্য একালের পাঠকের কাছেও সর্বসম্মতিক্রমে উৎরে যেতে পারল না। যতই কেন সূক্ষ্ম বিচার হক, ব্যাখ্যা হক, পরিবর্তিত রুচির সমর্থন সে পেল না। বিশুদ্ধ রসবাদীকেও হার মানতে হয় সাময়িক কালের সাময়িক রুচির কাছে।

এই ঘটনা অনেক সময়েই আমাদের নৈরাশ্যে পূর্ণ করে। মানুষের মন একটা ধ্রুব আশ্রয় খোঁজেই। নিত্যচলিষ্ণু কালের ঢেউয়ে আছাড় খেয়ে ভেসে বেড়ানোর কল্পনায় শূন্যতা বোধ করি। এই জন্যই অতীন্দ্রিয় লোকের কথা ভেবে মানুষ সান্ত্বনা পায়। সাহিত্যেও কী সেই রকম কোনো আশ্রয় নেই সাময়িক কালের হৈ-হট্টগোলের পর যেখানে চিরদীপ্তিতে অম্লান হয়ে সে বিরাজ করতে পারে? চিরন্তন সাহিত্য আমাদের রুচির কাছে ম্লান হলেও রসবোধের কাছে অম্লানই থাকে এ-কথা তো অস্বীকার করবার উপায় নেই। তা না হলে ক্লাসিকের মর্যাদা থাকত না। মুষ্টিমেয় সংখ্যক হলেও তাদেরই মধ্যে ক্লাসিকের চর্চা হয়ে থাকে। মুষ্টিমেয় বলেই উপহাস করবার প্রয়োজন নেই। কারণ রসিকের সংখ্যা সংখ্যাহীন হবে—এমন আশাই বা করব কেন?

পাঠক হিসাবে আমাদের সচেতন থাকতে হবে দ্বৈতবোধে। কোন্‌টা রস এবং কোন্‌টা রুচি, এ-ভেদ রক্ষা করে চলাই সত্যকার সাহিত্যপাঠ। রুচির পরিবর্তন হবেই তবে রসের পরিবর্তন হয় না। এ-দুয়ের সূক্ষ্ম পার্থক্য করে চলা কঠিন কাজ সন্দেহ নেই। সেজন্য রসনির্ণয়ের মানদণ্ড আছে। সাহিত্যসৃষ্টির গোড়া থেকেই প্রায় মানদণ্ড দেবার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু মজা এই যে মানদণ্ডটিও অবিচল থাকেনি। পুরনো মানদণ্ডে একালের সাহিত্য-বিচার করা চলে না। বোধহয় মানদণ্ডের পরিবর্তনশীলতার জন্যই রসের চিরন্তনতার সম্বন্ধেও মাঝে মাঝে সংশয়

উপস্থিত হয়। কিন্তু সেটা বড়ো কথা নয়। কারণ অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যা উৎকৃষ্ট—মানদণ্ডের পরিবর্তন সত্ত্বেও তার রসবত্তা অক্ষুণ্ণই থাকে। সেক্ষেত্রে রসবিচারের পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। যে-পদ্ধতির নিত্যতা নেই তার অনুসরণের সার্থকতা কি? সার্থকতা অবশ্যই আছে। কারণ যে-কোনো যুক্তিসঙ্গত মানেই বিচার করা যাক সাহিত্যের সৌন্দর্য নতুন ভাবে ধরা দেবেই। অবশ্য সাহিত্য যদি সত্যিই উৎকৃষ্ট হয়ে থাকে।

এইজন্য বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সাহিত্যিক মানের প্রয়োজনীয়তা যেমন আছে, তেমনি আছে সার্থকতা। শেক্সপীয়রের সাহিত্যের আলোচনার আদর্শ তো কতোবারই বদলাল। বিভিন্ন পরীক্ষাতে চিরন্তন সাহিত্যের স্বরূপটি নানা ভঙ্গিতে ধরা দেয়। ব্র্যাডলির আলোচনাতে শেক্সপীয়রের সাহিত্য যে অপূর্ব বিভায় বিভান্বিত হয়েছে এমসনের আলোচনাতেও তেমনি হয়েছে। সাহিত্য সমালোচনায় ঐতিহাসিক পদ্ধতিও তেমনি। অবশ্য তার সার্থকতা আছে। সমালোচনার স্কুল আছে, যুগ আছে। সে-সবের সঙ্গে পরিচয়সাধনে সমৃদ্ধি অর্জন ছাড়া দৈন্য বরণ নেই। এখানেই হয়তো রুচির কথা আসবে। কোন স্কুলে পাঠকের রুচি পাঠক তা জানেন এবং অন্য স্কুলের রীতিতে তাঁর রুচি নেই। আমার মনে হয়, সতর্কতার যথার্থ প্রয়োজনও এখানেই। 'কালচার' বলে তাকেই যখন দৃষ্টি কোনো সংস্কারে অন্ধ হয়ে না যায়। ব্যক্তিগত সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে এই কালচারের যেমন প্রয়োজন সাহিত্য পড়তেও তেমনি একটি কালচার্ড মনের প্রয়োজন। সংস্কৃতিমান মন রুচিকে উপেক্ষা করে না, সহ্য করে। কিন্তু রসকে চিনে নিতেও তার ভুল হয় না।

সাহিত্যনীতি ও লোকনীতি

আজকাল আমরা জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের যোগকে নিষ্ঠার সঙ্গেই বিশ্বাস করে থাকি। জীবনকে সাহিত্যে যথাযথ প্রতিফলিত না দেখলে আমরা তৃপ্তি পাই না। যে-সাহিত্যে পারিপার্শ্বিকের ছায়াপাত ঘটেনি, তাকে সার্থক সাহিত্য বলতে কুণ্ঠিত হই। রবীন্দ্রনাথের গল্পকে একবার জনৈক সমালোচক গীতধর্মী বলেছিলেন বলে রবীন্দ্রনাথ ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। তাঁর মতে গীতধর্মী বলায় তাঁর গল্পের বাস্তবতা অস্বীকৃত হয়েছে। তিনি তো কল্পনার উপকরণ নিয়ে গল্প লেখেননি, নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয় দিয়েই গল্প রচনা করেছেন। একদা পদ্মাবক্ষে ঘুরে বেড়ানোর সময়ে বাঙালির হাসি কান্নাভরা যে জীবন তাঁর চোখে ধরা দিয়েছিল, তাই দিয়েই তাঁর এক একটি গল্প তৈরি হয়ে উঠেছে। অভিজ্ঞতার এই ভূমিকা পূর্ববর্তীদের রচনায় ছিল না। যেখানেই কাহিনী কল্পনাসর্বস্ব সেখানেই রোমান্স, বাস্তবভিত্তি তার শিথিল।

কিন্তু জীবন তো নীতিবর্জিত নয়। যে-সমাজ নিয়ে গল্প উপন্যাস লেখা হয় সে একটি বাস্তবভিত্তিসম্পন্ন বিশিষ্ট সমাজ। অতএব সেই সমাজের নিজস্ব নিয়ম-নীতি থাকবেই। দক্ষিণরাঢ়ী সমাজের কোনো চরিত্র নিয়ে যদি উপন্যাস লিখতে হয়, তবে দক্ষিণরাঢ়ী সমাজের প্রচলিত নীতিও কি সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই এসে যাবে না? যদি কোনো লেখক সেই বিশিষ্টতাকে উপেক্ষা বা লুপ্ত করে চরিত্রটির পরিকল্পনা করেন তবে তাকে আর দক্ষিণরাঢ়ী বলার সার্থকতা কি? ঠিক এমনি করেই বহু সংস্কার বহু সামাজিক নীতি ও প্রথা দিয়ে বাস্তব সত্তাটি তৈরী হয়। সুতরাং সাহিত্যকে যদি বাস্তব হতে হয় তবে সাহিত্যে বিশেষ ক'রে উপন্যাসে এ-সব লক্ষণকে মানতেই হবে। এই বাস্তবকে আমরা একালের সাহিত্যে পরম মূল্য দিয়ে থাকি। লেখকরা গর্ব করেই বলেন, অভিজ্ঞতায় আমরা যা দেখেছি, সাহিত্যে তাকেই রূপ দিয়েছি। একালের শহুরে সমাজে পরস্বাপহারী ধনী, বিবেকহীন ভদ্রলোক, বিশ্বাসহীন যুবক, শিক্ষিত প্রবঞ্চক, আত্মসর্বস্ব অন্ধ—এ-সব তো সর্বদাই দেখতে পাই। উপন্যাসে গল্পে তারাই এসে ভীড় করছে। এদের কীর্তিকলাপ দেখলে সাহিত্যের শ্রী নষ্ট হল বলে মুষড়ে পড়লে চলবে কেন? সাহিত্যের পাঠক হিসাবে আমাদের বিচার্য হচ্ছে, ছবিটি যথাযথ হয়েছে কিনা। যথাযথ যদি হয়ে থাকে, তবেই বাস্তব মর্যাদা পেল, সাহিত্যও সার্থক হোল।

এই বক্তব্যের সঙ্গে স্বভাবতই আরও নানা প্রশ্ন জড়িয়ে থাকে। সাহিত্যের চরম লক্ষ্য কি বাস্তবতা সৃষ্টি করা? বাস্তবতা পাঠকের মনে কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে সেটা কি চিন্তনীয় নয়? দ্বিতীয়ত, বাস্তবতার সঙ্গে অসন্তোষ বিক্ষোভ বিরাগ ঘৃণা এ সবই কি শুধু থাকবে? শান্তি, প্রেম, সংযম সৌন্দর্য, মুগ্ধতা এ সবও কি বাস্তবচিত্রের মধ্যে আসে না? তৃতীয়ত, সাহিত্যের কি নিজস্ব কোনো নীতি নেই, সে কি শুধু বাস্তবের অনুগমনই করবে?

একটা কথা মানতেই হবে। সাহিত্যসৃষ্টি সম্বন্ধে একালে দুটো মত পাশাপাশি চলছে। একটি মত বলে, সাহিত্য বাস্তবের অনুসরণ করবে—বাস্তবের প্রতিফলনই সাহিত্যের সার্থকতার মানদণ্ড। আর একটি মত বলে, সাহিত্য বাস্তবতাকে মানতে বাধ্য নয়। সাহিত্যসৃষ্টিতে লেখকের অনুভূতি তাঁর বিশ্বাসই শেষ কথা। এই দ্বিতীয় মতের বিশ্বাসীদের সম্বন্ধে এলিয়ট বলেন, These liberals are convinced that only by what is called unrestrained individualism will truth ever emerge. Ideas, views of life, they think, issue distinct from independent heads, and in consequence of their knocking violently against each other, the fittest survive, and truth rises triumphant. Anyone who dissents from this view must be either a medievalist, wishful only to set back the clock, or else a fascist, and probably both.

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা সাহিত্যসৃষ্টির অনন্যতায় একান্ত বিশ্বাসী। সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের যোগ থাকতেও পারে নাও পারে। সাহিত্যের সার্থকতা দেখতে হবে অনুভূতির আন্তরিকতা দিয়ে অথবা অনুভূতিকে প্রকাশ করবার দক্ষতা দিয়ে। অতএব এখানে নীতির প্রশ্নটি একান্ত গৌণ। প্রকাশের একটা নীতি বা নিয়ম থাকতে পারে—সেটা অন্য ব্যাপার কিন্তু সমাজের নীতির কোনো প্রসঙ্গ এতে নেই। অনুভূতির আন্তরিকতা কথাটা কবিতা রচনার ক্ষেত্রে যতটা সহজবোধ্য ও নিঃসংশয়, উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে তা নয়। উপন্যাস রচনায় লেখকের নিজস্ব আদর্শ থাকতে পারে। কিন্তু যেহেতু উপন্যাসের বিষয় মানুষ এবং তার সমাজ, সেখানে সেই সমাজের নিয়মনীতিকে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া যায় কি করে? কতকগুলি ঘটনা, চরিত্র এবং পরিবর্তনধারা বা ক্রিয়া দেখানো হবেই। যদি সেই সবকে বিশিষ্ট রূপ নিয়ে ফুটে উঠতে হয় তবে বাস্তবনীতি দিয়েই তা সম্ভব। লেখকের অনুভূতি যদি বাস্তব পরিচয়কে অবহেলা করে স্বেচ্ছাচারী কল্পনায় উন্মার্গগামী হয়, তবে যাই হোক, উপন্যাস হবে না। অবশ্য এ কথা বলারও অর্থ নেই যে, লেখকের আন্তরিক অনুভূতি মাত্রই বাস্তববিদ্রোহী হবে। বাস্তবকে অবলম্বন করেও লেখকের অনুভূতি এক নিজস্ব পথে বিচরণ করতে পারে। অর্থাৎ গল্পের চরিত্র এবং ঘটনা বাস্তবরূপে স্পষ্ট হয়েও লেখকের কল্পনায় এমন পরিণতিতে পৌঁছতে পারে যা বাস্তবে ঘটতে দেখা যায় না।

লেখকের কল্পনা বাস্তবকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে যে শিল্পরূপ সৃষ্টি করে তোলে তা মনোহারী হতে পারে। সেক্ষেত্রে মনোহারিত্ব নির্ভর করবে শিল্পরূপের সৌষম্যে, বাস্তব সত্য-মিথ্যায় নয়। একে বলা হয় শুদ্ধশিল্পবাদ—আর্ট ফর আর্টস-সেক। এই তত্ত্বে কোন লোকনীতি নেই। সমাজ বা জীবনের সঙ্গে লেখকের কোনো দায়িত্ব-বন্ধন নেই। সমাজকে যথাযথ চিত্রিত করার দায়িত্ব যেমন থাকে না আর্ট-সর্বস্বতার তত্ত্বে, তেমনি সমাজের কল্যাণ-আদর্শের ভাবনাও তাতে থাকে না। এক কথায় বলতে গেলে সমাজ বা জীবনের কোনো গুরুত্ব আর্টে থাকে না। রবীন্দ্রনাথ এই কারণে শুদ্ধশিল্পবাদীদের সাহিত্যকে ঠিক পছন্দ করতে পারেননি। তিনি বলতেন, গোটিয়ের প্রভৃতি লেখকেরা জীবনের সত্যকে বড়ো সংকীর্ণ করে দেখেছেন। তাঁর মতে শেক্‌স্‌পীয়রের রচনায় মানবজীবনকে বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে

দিয়ে পাই বলেই তার মূল্য এত বেশি। টলস্টয় বা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে আমরা মানবজীবনের নিত্যরূপকে দেখি। তাঁদের আমরা নিশ্চয়ই শুদ্ধ শিল্পবাদী লেখক বলি না, যেমন বলি না শেক্‌স্‌পীয়রকে। বঙ্কিমচন্দ্র এবং টলস্টয় একটা সামাজিক কাঠামোর মধ্যে তাঁদের কাহিনীর পত্তন করেছেন। কিন্তু চন্দ্রশেখর উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র যখন শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত দেখান, কিংবা কৃষ্ণকান্তের উইলে যখন রোহিণীর হত্যা দেখান, টলস্টয় রেজারেকশানে যখন তীব্র আত্মানুশোচনা দেখান তখনও কি তাকে জীবননীতিরই রূপায়ণ বলব, না, লেখকের বাস্তববিচ্ছিন্ন অনুভূতিরই চরিতার্থতা বলব? আমরা আজকাল বলি কাহিনীর এই গতি আর্টের প্রয়োজনে নয়, কল্যাণবোধের প্রয়োজনে। জীবননীতিই এখানে সাহিত্যের নিয়ামক। এতে বাস্তবের প্রতিফলন হলেও এতে আদর্শের টান বাস্তবকে ভিন্নমুখী করেছে বলে মনে করে থাকি।

সাহিত্য বাস্তবকে অনুসরণ করবে—এই মতটা খুব পুরনো মনে হলেও বস্তুত খুব পুরনো নয়। প্রকৃতির অনুকরণ কথাটা, আমরা সবাই জানি, অ্যারিস্টটলের সময় থেকেই চলে এসেছে। বলা বাহুল্য তার তাৎপর্য কিছু ভিন্ন। সমাজ বলতে আমরা অন্য অর্থ বুঝি। এক অর্থে সেটাও প্রকৃতির অনুকরণ বটে, কিন্তু একটা সীমায়ত স্থান কাল এবং মানবচরিত্রের। প্রকৃতি বলতে যে ব্যাপকতা বোঝায় তার কোনো সাময়িক নীতি নেই। সে একটা বৃহৎ মানবনীতি, নিয়তি, হাসি-কান্নার নিত্যলীলা। এই নিত্যলীলা দিয়েই রচিত হয়েছে গ্রীক নাটক, শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক, গ্যেটের মহাকাব্য। এই সব সাহিত্যে অঙ্কিত চরিত্রও কোনো বিশিষ্ট সমাজেরই বটে, কিন্তু এর সামাজিক আচার বন্ধনটির চেয়েও একটা বৃহৎ জীবনচেতনাই আমরা বিশেষ করে অনুভব করি।

যে সমাজ ছিল বিশ্বনীতির পক্ষপুটে, সেই সমাজ আপন অস্তিত্বকে প্রবল করে তুলল গত শতাব্দী থেকে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি শ্রমশিল্পের বিস্তার এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তন সামাজিক অস্তিত্বকে বড়ো বেশি অনুভব করিয়ে দিল। এখানে প্রমথ চৌধুরী কথিত একটি অনুচ্ছেদেই আমাদের আলোচনাকে সংহত করে নিয়ে আসা যায়—

'ইউরোপের দার্শনিক জগতেই এ শব্দটি (রিয়ালিজম) আদিতে জন্মলাভ করে। আইডিয়ালিজ্‌মের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়েই রিয়ালিজ্‌ম দর্শনের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় এবং সেই অবধি আজ পর্যন্ত এ উভয়ের যুদ্ধ সমানে চলে আসছে। দর্শনের ক্ষেত্রে যে যুদ্ধের সূত্রপাত হয় ক্রমে তা সাহিত্যক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষত গত শতাব্দীতে বিজ্ঞানের সহায়তা লাভ করে রিয়ালিজ্‌ম ইউরোপীয় সাহিত্যে একাধিপত্য লাভ করবার উদ্দেশ্যে সকল প্রকার আইডিয়ালিজ্‌মের উপরে প্রবল পরাক্রমের সহিত আক্রমণ করে।'

তত্ত্বের ক্ষেত্রে কাণ্টের প্রতিক্রিয়ায় পজিটিবিজ্‌মের উদ্ভব। মানুষের ভাবনার ক্ষেত্রে পজিটিবিজ্‌মের প্রভাব পড়েছে প্রচুর। হয়তো মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিমার পরিবর্তনে পজিটিবিজ্‌মের মতো মতের প্রসার ঘটেছিল—কথাটা এভাবে বলাই সুষ্ঠু। যে ভাবেই

হোক মানুষের জীবন—যা সাহিত্যে প্রতিফলিত হবে, সে জীবনও হবে প্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষ হবে তার নীতি নিয়ম, তাকে কেবল অনুভবগম্য হলে চলবে না, তাকে হতে হবে বুদ্ধি গম্য। এই প্রবণতাতেই 'ন্যাচারিলিস্টিক' সাহিত্যের বিকাশ ঘটল।

ন্যাচরালিজ্‌মের যুগ বিগত। পজিটিবিজ্‌মের যুগও চলে গিয়েছে কিন্তু যে-সব চিন্তাভাবনা মানুষের চিত্তক্ষেত্রে কিছুকাল হলেও রাজত্ব করে, তারা বিদায় নিলেও তাদের প্রভাব রূপান্তরিত হয়ে থেকেও যায়। সাহিত্যে মানুষ হয়ে উঠল সমাজের মানুষ, সে-সমাজের নীতিনিয়মগুলি মানুষেরই গড়া। নীতিনিয়মকে প্রত্যক্ষ করিয়ে মানবচরিত্রকে দেশে-কালে স্থাপিত করে দেখানোর আর্ট হল আধুনিক আর্ট। কারো হাতে সমাজের এই নীতি হল ধর্ম ও আচারের, কারো হাতে নীতি হল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার, কারো হাতে নীতি হল রাজনৈতিক পরিবর্তনের। এই সব নীতি মানব সমাজে প্রচলিত। এক সময়ে বড় হয় ধর্ম ও আচারের নীতি। মানুষকে এই নীতি দিয়েই বিশিষ্টরূপে চেনা যায়। কোনো ধর্মসমাজে যে আচার বা নিয়ম পালিত হয়ে আসে, লেখক সেই আচার-নিয়ম দিয়ে তার চরিত্ররূপকে গড়ে তোলেন। এই আচার-নীতিগুলি দীর্ঘকাল জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সমাজকে শাসিত করে আসে। এই নীতি দিয়েই তৈরী হয় স্বভাব বা সংস্কার। মানুষের ভালো-মন্দ ন্যায় অন্যায় সৎ অসৎ এরই প্রয়োগে নির্ধারিত হয়। এককালে সমাজের নীতি অপ্রচলিত বা পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। দ্রৌপদীর পঞ্চ বিবাহ অপ্রচলিত হয়ে যেতেই পারে, কিন্তু পরবর্তী কালের দৃষ্টিতে এই প্রথা মিথ্যা হয়ে গেলেও মহাভারতের চরিত্রকে বুঝতে গেলে একে উপহসনীয় বললে চলবে না। একালের ন্যায়-অন্যায় দিয়ে সেকালের চরিত্রকে বুঝতে গেলে চলে না। সাহিত্যে মানবচরিত্র সবিশেষ প্রত্যক্ষ, তার আচার-সংস্কার, বিশ্বাস-ধর্ম বেশভূষা বচনভঙ্গিমা সব দিয়েই সে জীবন্ত হয়ে ওঠে। এই প্রত্যক্ষতাবোধ এসেছে প্রবলতররূপে মানবচিন্তার পটপরিবর্তনের ফলে। আমরা আমাদের যুগের প্রবৃত্তিবশত কোনো কিছুকে না মেনে নিতে পারি, কিন্তু সাহিত্যের নীতি হচ্ছে চরিত্রকে প্রত্যক্ষ করে তোলা এবং এই প্রত্যক্ষতা আসে কাহিনী-নিহিত পরিবেশকে মেনে চলায়। শেষ পর্যন্ত হয়তো দেখা যাবে এই সঙ্গতিসম্পন্নতাই চরিত্র-সৃষ্টির মর্মরহস্য। সে-সঙ্গতি হচ্ছে চরিত্র এবং পরিবেশের সঙ্গতি।

এই কথাটিকে আর একটু ব্যাখ্যা করে বলা প্রয়োজন। ধরা যাক কোনো উপন্যাসের নায়িকা বিধবা। শুধু এই তথ্যই উপন্যাসের প্রধান তথ্য নয়। এই তথ্যটিকে প্রত্যক্ষ করে তুলতে হলে ওই নায়িকা কোন সমাজের এবং কোন যুগের তারও সুস্পষ্ট পরিচয় থাকা চাই। বিধবার প্রণয়পিপাসা যদি উপন্যাসের থীম হয় তবে তাতে কোনোই আপত্তি নেই, কেননা বিধবা যদি অষ্টাদশ শতাব্দীর সংস্কারাচ্ছন্ন আচারসংকুল হিন্দু সমাজের হয় তথাপি মানবহৃদয়ের স্বাভাবিক গতি হিসাবে তাকে দেখানো চলবে—শুধু চলবে না তার প্রেমকে সমাজে নির্বাধ করে দেখানো। সহস্র বাধা আসবেই—সে বাধা শুধু বাইরের আত্মীয় পরিজন থেকে নয়, সে-বাধা নায়িকার নিজের অন্তর থেকেও। কারণ তার সচেতন সংস্কার তার অবুঝ প্রেমকে দ্বিধাদীর্ণ করবে। এক্ষেত্রে আজকের যুক্তিবোধ দিয়ে যদি নায়িকার হৃদয়কে দ্বিধাহীন নিরঙ্কুশ

রূপে আঁকা যায় তবে সেটাই হবে সাহিত্যনীতিকে লঙঘন। এতে কিন্তু বাস্তবতাকে অস্বীকার করাই হবে। সাহিত্যনীতিকে রক্ষা করার অর্থ বাস্তবের সঙ্গতিকে রক্ষা করা। এইজন্য বঙ্কিমচন্দ্র বিষবৃক্ষে লোকনীতিকে রক্ষা করে-ও সাহিত্যনীতিকে রক্ষা করেছেন। রমেশচন্দ্র বিধবার সমস্যাহীন প্রেমের চিত্র এঁকেও লোকনীতিকে এবং বিবাহ দিয়েও সাহিত্যনীতিকে রক্ষা করতে পারেননি। বঙ্কিমচন্দ্র যদি কুন্দের স্বচ্ছন্দ সংসার দেখাতেন তবেই শুধু লোকনীতি নয়, সাহিত্যনীতিকেও লঙঘন করতেন। কুন্দ প্রণয়াবেগে অভিভূত বটে, কিন্তু তার সংস্কারের বাধাকেও তো অতিক্রম করতে পারেনি। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তার নগেন্দ্র-প্রেমেরই এক অতি-গভীর সঙ্গতি—নগেন্দ্রকে ভালোবাসে বলেই নগেন্দ্রকে সুখী দেখতে চায়। তার আত্মহত্যা তার আত্মিক সঙ্কটেরই পরিণাম। কৃষ্ণকান্তের উইলে রোহিণী হত্যা কি বিধবার প্রেমের লেখকপ্রদত্ত শাস্তি? না, গোবিন্দলালের প্রচণ্ড মানসিক দুর্যোগের বলি?

চোখের বালির উপসংহার নিয়েও নাকি রবীন্দ্রনাথ অনুশোচনা করতেন। বিনোদিনীর ওই পরিণাম নাকি ঠিক হয়নি। এ-অনুশোচনা নিরর্থক। যে রবীন্দ্রনাথ অনুশোচনা করেছেন, তিনি বহু পরবর্তী কালের, যখন বিধবার প্রেমের বাধা সমাজে লঘু হয়ে গিয়েছে অথবা লেখকের সাহিত্যনীতির চেয়েও শ্রেয়োবোধ বড়ো হয়েছে। বিনোদিনীর বুভুক্ষা মানবপ্রবৃত্তিবশত উদ্দাম হতে চাইলেও তাকে যে নিজের কাছেই নিজেকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে, এখানেই সাহিত্যনীতির সার্থকতা। এ বিনোদিনী যদি মধ্য-বিংশ শতাব্দীর নাগরিক সমাজের নায়িকা হত হয়তো এভাবে তার সার্থকতা হত না। এর অর্থ কি এই যে উপন্যাসে লোকনীতিকে সর্বদাই রক্ষা করে চলতে হবে? সেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্থান নেই?

এ-কথা অবশ্য সত্য নয়। বিশিষ্ট সমাজে বিশিষ্ট কালের লোকনীতিকে মেনে না চললে বাস্তবতা রক্ষিত হয় না সত্য, কিন্তু কখনো কারো মধ্যে সমাজ-নীতি-বিরোধী প্রবণতা যদি দেখা দেয় তবে তার যথোপযুক্ত সঙ্গতি রক্ষা করেই লেখকের সেটা দেখানো কর্তব্য হবে। উপন্যাস নামক বিশিষ্ট শিল্প হচ্ছে লেখকের বক্তব্যবাহী। একালের একটি নিজস্ব ফসল উপন্যাস। সমাজের প্রচলিত আচার প্রথা নীতি-নিয়ম সম্বন্ধে লেখকের সমালোচনা করবার এবং তাকে আভাসিত করে তোলবার জন্যই উপন্যাসের উদ্‌ভব। কিন্তু সে বক্তব্য—সাহিত্যনীতিবিরোধী হলে চলবে না। অর্থাৎ কাহিনীর সঙ্গতি রক্ষিত হওয়া চাই। রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে লেখকের একটি বক্তব্য ফুটে উঠেছে মৃণালের বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে। মৃণালের বিদ্রোহ সমাজনীতির বিরুদ্ধে। সম্ভবত এর মধ্যে নারীস্বাতন্ত্র্যের যে-ধারণা প্রকাশ পেয়েছে সেটা তৎকালীন ভাবান্দোলনের ফল। সবুজপত্র এবং অন্যান্য স্থলে এই নতুন চিন্তার প্রকাশ ঘটেছিল। তবু বক্তব্যের যোগ কাহিনীর সমাজ পরিবেশ ও বাস্তবনীতির সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন যদি হয়ে থাকে তবেই সাহিত্য হিসাবে তার সার্থকতা।

এখানে একটা পুরনো কিন্তু চিন্তনীয় বক্তব্য উদ্ধার করি। সে-মন্তব্য ম্যাথু আরণল্ডের—

The grand power of poetry is its interpretative power ; by which I

mean not a power drawing out in black and white an explanation of the mystery of the universe, but the power of so dealing with things as to awaken in us a wonderfully full, new and intimate sense of them, and of our relation with them. When this sense is awakened in us as to objects without us, we feel ourselves to be in contact with the essential nature of those objects, to be no longer, bewildered and oppressed by them, but to have their secret and to be in harmony with them.

ম্যাথু আরনল্ড বলছেন এই 'ইন্টারপ্রিটেটিভ পাওয়ার' (ব্যাখ্যাশক্তি) দু'রকমের হতে পারে—প্রথমত বিষয়ের সঙ্গে পাঠকের একাত্মতা সৃষ্টি ক'রে, দ্বিতীয়ত, বৈজ্ঞানিক বা নৈতিক এক ভিন্নতর বক্তব্যকে স্পষ্ট করে তুলে। দ্বিতীয়টি উচ্চতর সাহিত্যনীতির নয় যেহেতু The interpretations of science do not give us this intimate sense of objects as the interpretations of poetry give it; they appeal to a limited faculty, and not to the whole man.

বক্তব্য যখন বিষয়ের বিন্যাস ও বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে ব্যঞ্জিত হয়, তখন কাহিনীর ও বক্তব্যের একটা সমগ্র রূপ ফুটে ওঠে। কিন্তু কাহিনী-বিন্যাসের স্বাভাবিকতা থেকে বক্তব্য যখন আলাদা হয়ে উগ্র হয়ে ওঠে তখন সাহিত্যনীতি ক্ষুণ্ণ হয়।

এর একটা অতি চমৎকার দৃষ্টান্ত মেলে রবীন্দ্রনাথের কাহিনী কাব্যের কবিতাগুলির মধ্যে। এই বইয়ের বিভিন্ন কবিতায় লোকধর্ম ও বিশ্বধর্মের দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে। গান্ধারীর আবেদনে গান্ধারী বিশ্বধর্মের প্রতিভূ। দুর্যোধন রাজধর্মের প্রতিভূ আর ধৃতরাষ্ট্র সাধারণ দুর্বল মানব-হৃদয়ের প্রতিভূ। নরকবাসেও তেমনি লোকধর্ম পালন করতে গিয়েছেন রাজা সোমক, কবির নিজস্ব বক্তব্য অবশ্য মানবনীতির প্রতিষ্ঠা। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই এই বক্তব্যকে উদ্ধত করে তোলেননি। গান্ধারীর আবেদন নিস্ফল হল কিন্তু এক ভয়ংকর পরিণাম বিশ্বনীতির অন্ধ অনুবর্তনের মধ্যে দিয়ে আসন্ন হয়ে উঠল। কুন্তী ধর্মকে ভাসিয়ে দিয়ে লোকধর্ম পালন করল কিন্তু যে জগৎ-নীতি মানুষের রচিত লোকনীতির অতীত দুরধিগম্য, সেই নীতি যথাসময়ে কুন্তীর ট্রাজেডিতে পুত্রবিনাশের মধ্যে দিয়ে সত্য হয়ে উঠল। কবি এক অসাধারণ সঙ্গতিবোধ দিয়ে লোকনীতি ও বিশ্বনীতির দ্বন্দ্ব দেখিয়ে তার বক্তব্যটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন এবং উচ্চাঙ্গের সাহিত্যনীতিকে রক্ষা করেছেন।

মানবচরিত্রকে সৃষ্টি করতে গেলে, কাহিনীর বাস্তবতাকে রক্ষা করতে গেলে লোকনীতিকে কিছুতেই বাদ দিয়ে তা করা যায় না। কিন্তু বাস্তবতাকে বৃহত্তর সমগ্রতাবোধের সঙ্গে মিশিয়ে না দিলে সাহিত্য হিসাবে তাতে গভীরতার স্পর্শ আসবে না। রাষ্ট্রনৈতিক বক্তব্য, অর্থনৈতিক বক্তব্য—উপন্যাসে আসবেই, কিন্তু সে-সব বক্তব্যকে বিষয়বিন্যাসের সাহায্যে খণ্ডিত বা বিচ্ছিন্ন না রেখে সামগ্রিক করে তুলতে পেরেছিলেন বলেই টলস্টয়েব উপন্যাস মহৎ, রবীন্দ্রনাথের গোরা মহৎ কিন্তু শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন নয়।

ভাষা ও স্টাইল

সাহিত্য ভাষারই সৃষ্টি। সে জন্যই সাহিত্যের যতগুলি গুরুতর সমস্যা আছে ভাষার সঙ্গে সাহিত্যসৃষ্টির সম্পর্ক নির্ণয়ের সমস্যা তাদের মধ্যে অন্যতম বলে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। এ-বিবেচনা চিরকাল হয়ে আসছে এ-কথা সত্য, কিন্তু মনে হয় এ-আলোচনার প্রয়োজন কখনও ফুরোবে না।

সাহিত্য নিত্যনবরূপে প্রবহমান বলেই বার বার তাকে যাচাই করে দেখতে হয়। লেখকের সাধারণ অভ্যাস চিরকাল তো একরকম থাকে না ; আবার ভিন্ন ভিন্ন মুহূর্তে ভাষাদেহে নানা বহিরঙ্গ পরিবর্তনও ঘটে চলেছে, লেখক তাকে স্বীকৃতি না দিলে ব্যর্থতার বোঝাই বাড়াবেন। ভাষাসৃষ্টি করবার তাগিদ দু-দিক থেকেই আসতে পারে—বাইরের প্রয়োজনে এবং অন্তরের প্রয়োজনে, দু-তরফেই অনেক কথা বলবার আছে।

মুখের ভাষা মানুষ সহজ ভাবেই পায়। সেখানে শিক্ষিত-অশিক্ষিতে ততটা ভেদও থাকে না। এই ভাষা গড়ে ওঠে নানা পারিপার্শ্বিক কারণে। নতুন শব্দ আমরা পাই, নতুন বাক্‌ভঙ্গি দেখা দেয়। এই বৈজ্ঞানিক যুগে এমন শব্দ স্বভাবতই আমাদের অজ্ঞাতসারেই এসে যাচ্ছে আমাদের মুখে, যাকে আমরা আগে স্বাভাবিক মনে করিনি। আজকের বাংলা ভাষায় এমন সব শব্দ অহরহই ব্যবহার করি যেগুলি না করে আর উপায় থাকে না। ঘেরাও, ভরতুকি, লাগাতার, জোরালোর জায়গায় জোরদার এসব শব্দ কয়েক বছর আগেও চলতি ছিল না। 'বক্তব্য রাখছি' 'প্রস্তাব রাখছি'—এ ধরনের প্রয়োগ তো আজকাল অত্যন্ত সাধারণ। এখনও কোনো কোনো পণ্ডিত এসব প্রয়োগ নিয়ে আপত্তি করে থাকেন। ভাষার বিশুদ্ধতা অথবা ভাষার আপন প্রকৃতির প্রসঙ্গ তুলতে তাঁরা ভালোবাসেন। ভাষাপ্রকৃতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে তাঁরা প্রায়শ দুঃখ প্রকাশ করে থাকেন। এটা কিন্তু নতুন নয়। সেকালের দিনে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন তাঁর ভাষায় খাঁটি বাংলা ছাড়া কোনো প্রয়োগ কখনও দেখা যাবে না। এ নিয়ে তাঁর গর্ব ছিল। আজ কিন্তু এ-গর্ব আমাদের কাছে অর্থহীন মনে হয়। খাঁটি বাংলা বলে সত্যিই কি কিছু আছে?

ইংরেজি ভাষা যতদিন আমাদের দেশে ইস্কুলে চলতি ছিল না অর্থাৎ সে ভাষার শব্দ আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের বাহন হয়ে অবশ্যব্যবহার্য হয়নি, ততদিন বাংলার একটা প্রকৃতি ছিল। তখন দেশে ছিল মুসলমান রাজত্ব। ফারসি শব্দের ব্যবহার ছিল সহজ এবং স্বাভাবিক। বাংলা ভাষায় এসব ভাষার শব্দ সহজেই মিশে গিয়েছিল। তখন খাঁটি বাংলা কি ছিল? ভারতচন্দ্র লিখেছিলেন :

যে হউক সে হউক ভাষা কাব্যরস লয়ে।

সেই ইংরেজিবর্জিত মুসলমানী কিংবা দেশীয় শব্দ-সমাকুল ভাষাকেই খাঁটি বাংলা যদি বলা যায় তবে বাংলা ভাষারও যে-সমৃদ্ধি আমরা পরের দুশ বছরে

দেখতে পাচ্ছি তাকে অস্বীকারই করা হয়। ইংরেজি গদ্যের আদর্শে আমাদের গদ্য তৈরি হয়ে উঠেছে বলেই এ-গদ্যের ভাব ভঙ্গির সঙ্গে আগের গদ্যনমুনার কোনো মিলই নেই। বাঙালি যদি ইংরেজ যুগের নতুন ভাবধারায় আত্মস্থ হয়ে থাকে তবে তার ভাষায় নতুনত্বের স্পর্শ লাগাই স্বাভাবিক। ভাষা তাতেই জীবন্ত থাকে, মরুপথে হারিয়ে যায় না। এই জীবন্ত ভাষা অবলম্বনেই সাহিত্যের জন্মান্তর হয়। তাই সাহিত্যের ভাষাও চিরকাল একই রকম অনড় হয়ে থাকতে পারে না। বাংলা গদ্যের প্রথম যুগে বিদ্যাসাগর যে-আদর্শ দিয়ে গিয়েছিলেন বঙ্কিমী গদ্য তার থেকে যে আলাদা হয়ে গিয়েছে, সে তো শুধু লেখক বিশেষের রুচির ফল নয়, অনেকটা পারিপার্শ্বিকেরই ফল। বিদ্যাসাগরের সেই দীর্ঘস্পন্দী বাক্যবিন্যাস সেই উদাত্ত ধ্বনি-গাম্ভীর্য সেই শুদ্ধ শুচি সংস্কৃতজ শব্দের শোভাযাত্রা বঙ্কিমচন্দ্র রাখেননি। 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধেই তিনি বলেছিলেন ভাব প্রকাশের জন্য যে রকম প্রয়োজন হবে একমাত্র অশ্লীল ছাড়া সব রকম শব্দই সাহিত্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। তিনি নিজে কপালকুণ্ডলা দুর্গেশনন্দিনীর চেয়ে কৃষ্ণকান্তের উইল আনন্দমঠে ভাষা ব্যবহারে অনেক উদার হয়ে উঠেছেন। শুধু শব্দের ক্ষেত্রেই নয় বাক্যগঠনেও বঙ্কিমচন্দ্র আপন পথ তৈরি করে নিয়েছেন তাতে ইংরেজি গন্ধ ছিল, আধুনিক ত্বরিত ভঙ্গিমা ছিল। লোকরুচির নিকটবর্তিতা ছিল। বাংলা ভাষার যে পথ তিনি নির্দেশ করে দিলেন, সে-ও তো টিকে থাকল না। বীরবল এসে তার চরিত্র পরিবর্তন করে দিলেন। 'বাংলা ভাষা-পরিচয়' লিখবার সময়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন সাহিত্যের আসর থেকে গুরুচণ্ডালী দোষ উঠেই গেছে। একালের ভাষার দিকে তাকালে বোঝা যায় শুধু গুরুচণ্ডালী কেন ব্যাকরণ ও রচনারীতির অনেক অনুশাসনই নিরর্থক হয়ে পড়ছে। ইংরেজি সাহিত্যেও যে-অষ্টাদশ শতকের গদ্য নিয়ে ম্যাথু আরণল্ডের এত গর্ব ছিল, ভিক্টোরিয় যুগে তার জাত্যন্তর ঘটেছে। বিংশ শতাব্দীতে এলিয়টের গদ্যরীতির সঙ্গে তারও কোনো মিল খুঁজে পাওয়া সহজ হবে না।

সাহিত্যে আমরা কি নিয়তিকেই মেনে নেব? এই পরিবর্তন বাস্তব বলে ভাষার রূপান্তরকে শিরোধার্য করেই সাহিত্য গড়ে উঠবে? সাহিত্য কি নিত্য নব পরিবর্তনের দাস, ভাষার সেবক? প্রভু কে? সাহিত্য না ভাষা?

এখানেই সাহিত্যের আর এক প্রশ্ন এসে যায়। লিখিত ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি হল বটে। কিন্তু লিখিত ভাষা মাত্রই সাহিত্য নয়। লিখিত ভাষায় খবরের কাগজ প্রচারপত্র, বিজ্ঞাপন, প্রতিবেদন, হিসাব—এ সবই হতে পারে, সেজন্য সাধারণে প্রচলিত লোকমুখে গৃহীত ভাষাই যথেষ্ট কিন্তু সাহিত্যিক যখন সাহিত্য সৃষ্টি করতে বসেন, তখন ভাষা সম্বন্ধে তার একটা বিশেষ সচেতনতা দেখা দেবেই। তখন ভাষার সমস্যা একটা ভিন্ন আকার ধারণ করে। তখন আসে স্টাইলের প্রশ্ন। স্টাইলের সঙ্গে সদাপ্রচলিত ভাষার সম্পর্ক নির্ণয় একটা বিশেষ সাহিত্যিক কর্তব্য।

সাহিত্যসৃষ্টিতে স্টাইল-তত্ত্ব পূর্বতন মনীষীদের মধ্যে বোধহয় এমন গুরুতর

বিষয় ছিল না। আমাদের দেশে রস-সৃষ্টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। য়ুরোপেও মহাকাব্য নাটক ইত্যাদির নির্মাণ-কৌশল নিয়ে আদি সমালোচকরা সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। ভাষা সম্বন্ধে তাঁদের ভাবনা ছিল না—তা বলা যাবে না অবশ্যই। কারণ অ্যারিস্টটল তাঁর কাব্যশাস্ত্রে ভাষা এবং ব্যাকরণ নিয়ে ব্যাখ্যা করার আগে তাঁর প্রধান আলোচ্য বিষয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। ভাষার আলোচনা দরকার হয়েছে সাহিত্য-বিষয়টাকে যথোপযুক্ত বাহন-যুক্ত করে দেবার জন্য। ভাষার সঙ্গে সাহিত্য-সৃষ্টির গূঢ় মর্মরহস্য নির্ধারণ করবার উদ্যোগ তাঁর ছিল না। আমাদের দেশেও তাই। যদিও কাব্যতত্ত্ব আলোচনার রসশাস্ত্রীরা আশ্চর্য মনীষার পরিচয় দিয়েছিলেন, তৎসত্ত্বেও ভাষার স্টাইল বলতে আমরা যা আজকাল বুঝি তাঁরা সেদিকে তেমন মনোযোগী হননি। অথচ ভাষার সাধারণ শুদ্ধাশুদ্ধি বিচারে তাঁরা ছিলেন অক্লান্ত। শব্দের শক্তি নিয়ে নানা সূক্ষ্ম দার্শনিক আলোচনা তো ছিলই, শব্দব্যবহারের উপযুক্ততা নিয়েও নানা নিয়ম-নীতি ছিল। বস্তুত আমাদের দেশে সাহিত্যপাঠ বলতে এক সময় কাব্যদেহের এই বিশ্লেষণকেই বোঝাত।

এ-সব সত্ত্বেও ইদানীং ভাষা এবং স্টাইল সম্বন্ধে যে-ধরণের অনুসন্ধিৎসা দেখা গেছে সেকালের চিন্তায় ঠিক সে-জিনিস ছিল না। উনিশ শতকের ইংরেজি সমালোচনায় স্টাইল সাহিত্য সৃষ্টিরই পরম রহস্য হয়ে উঠেছিল। আমাদের প্রাচীন সমালোচনায় রস-রহস্য যে-স্থান নিয়েছে, পেটার বা মিড্‌ল্‌টন মারির সমালোচনায় স্টাইলের স্থান তারই অনুরূপ। রীতি বলতে যা বুঝিয়েছে, স্টাইল তা নয়। রীতি সর্বজন অনুসরণযোগ্য রচনাদর্শ, বাংলায় আমরা যেমন চলিত রীতি বা সাধু রীতি বলি। স্টাইল লেখক-বিশেষের নিজস্ব আত্মপ্রকাশের ভাষারীতি। সে রীতি চলিত হতে পারে, সাধুও হতে পারে। কিন্তু সাধুই হোক আর চলিতই হোক, লেখককে যে-ভাষা ব্যবহার করতে হবে, সে ভাষা সর্বসাধারণের। 'চতুরঙ্গে'র রীতিই হোক, আর 'চার অধ্যায়ে'র রীতিই হোক, ভাবা বাংলাই। আমাদের তাই বিশেষ করে বিচার্য—এই ভাষার সঙ্গে স্টাইলের সম্বন্ধ কি? সর্বজনের ভাষাকে কি করে ব্যক্তি বিশেষের স্টাইলে পরিণত করা যায়। অর্থাৎ যে শব্দ, যে-বাক্যরীতি সকলের, তার মধ্যে থেকেই সাহিত্যের চরম সাফল্য লাভ করা যায় কি করে।

যে-ভাষা সর্বজনের তারও সমস্যা নেহাৎ কম নয়। আমরা বলেছি জীবন্ত ভাষাকে লেখকের মেনে চলতেই হবে। এখনকার বাঙালি লেখক মধ্যযুগের বাংলা ব্যবহার করবেন; এটা আশা করা যায় না। কমল মজুমদার যে-ভাষা ব্যবহার করে থাকেন, সে-ভাষা সকলের সহজবোধ্য কিনা সন্দেহ। ভাষার একটা কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া ব্যবহারের সাধারণ নীতি থাকে। যতি-চিহ্ন স্থাপনেরও নীতি আছে। সে নীতি লঙঘন করে যাওয়া যে কোনো কারও পক্ষেই কঠিন। কারণ অর্থ বোঝবার এবং বোঝানোর একটা অভ্যস্ত সংস্কার থাকেই। মানুষ সেই সংস্কারের মধ্যেই শিক্ষা ও অভ্যাস পেয়ে থাকে। বাক্যগঠনে অনভ্যস্ত পরিবর্তন করলে কিংবা যতি

স্থাপনে অপ্রত্যাশিত এবং অনাবশ্যক অভিনবত্ব নিয়ে এলে পাঠকের মানসক্রিয়ায় আঘাত পড়ে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা একালে অপ্রচলিত হয়ে গিয়েছে কিন্তু মনে রাখতে হবে সে-ভাষা বাংলার ভিত্তি স্থাপন করে গিয়েছে ভাষা-প্রকৃতিকে আবিষ্কার করে। এই প্রকৃতির তো আর পরিবর্তন হবে না। বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরী সকলেই বাংলার সেই ভাষা-প্রকৃতিকে মেনে নিয়েছেন বলে তাঁদের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও অভিনবত্ব সত্ত্বেও তাঁরা বাংলা ছাড়া আর কিছু লেখেননি। 'এই সেই জনস্থানবর্তী প্রস্রবণগিরি। ইহার শিখরদেশ সততসঞ্চরমান নবজলধরপটল সংযোগে নিবিড় নীলিমায় অলংকৃত'—বিদ্যাসাগরের এই বাক্যটি সংস্কৃতমূলক শব্দ দিয়ে সাজানো হয়েছে সত্য, কিন্তু বাক্যগঠনে বা যতিস্থাপনে যে-নীতি মেনে নেওয়া হয়েছে, সে-নীতি পরবর্তী বাংলা গদ্যে অব্যাহত আছে। কমল মজুমদারের গদ্যে সেই নীতি রক্ষিত হয়নি। একে লেখকের স্টাইল বলতে পারি না। তার কারণ এ রীতি ভাষাপ্রকৃতিকে লঙঘন করেছে বলেই পাঠকের সংস্কার পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হয়। তিনি নিজে যে এই ভঙ্গিমায় লিখতে পেরেছেন তার কারণ দুটি হতে পারে, সজ্ঞান ও সচেতন ভাবেই হয়তো তিনি অভিনবত্ব আনতে চান অথবা তাঁর ভাষাসংস্কার গড়ে ওঠেনি। সাহিত্যিক স্টাইল এ-দুয়ের কোনোটাতে স্বাভাবিক নয়।

আমাদের ভ্রান্তি ঘটে তখনই যখন ভাষাবিরোধী ভঙ্গিমাকে লেখার স্টাইল বলে গণ্য করি। রবীন্দ্রনাথ 'প্রাচীন সাহিত্য' বইতে যে-গদ্য লিখেছিলেন, তার সঙ্গে 'সাহিত্যের পথে'র গদ্যের রূপগত খুব কি সাদৃশ্য আছে? কিন্তু ভাষা প্রকৃতি নিয়ে নিশ্চয়ই সন্দেহের অবকাশ নেই? এই অভিনবত্ব স্বাভাবিক এবং আকাঙ্ক্ষিত। কারণ এর মধ্যে দিয়ে ভাষার শক্তি-সম্ভাবনার পরীক্ষা হয়, এবং তার দ্বারা সমৃদ্ধি আসে। আমরা আজ রবীন্দ্রনাথের সেই ধ্বনিমান শব্দসমৃদ্ধ সংস্কৃতমূলক গদ্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ কিন্তু ওই গদ্য এখন যে আর লেখা চলে না সে কথাও সত্য। লিখতে চেষ্টা করলেই যে লিখতে পারা যাবে, তাও নয়। সেইখানেই স্টাইল। ওই গদ্যের যেটুকু অনুকরণ করা যায় সেটুকু ভাষামাত্রই। এই ভাষানুকরণ আমাদের যথেষ্টই হয়েছে। দীর্ঘকাল আমাদের স্কুলে শিক্ষার্থীদের নিকট ওই গদ্যের আদর্শকেই অনুকরণযোগ্য বলে উৎসাহিত করা হয়েছে। প্রমথ চৌধুরীর তীক্ষ্ণ ভাষা নয়, চতুরঙ্গ—বাতায়নিকের পত্র যুগের পূর্বের রবীন্দ্র-গদ্য এখনও পর্যন্ত ভাষাশিক্ষার্থীর কাছে আদর্শ। এই ভাষার থেকেই আমাদের পরীক্ষার প্রশ্নোত্তরের ভাষার জন্ম—অর্থাৎ বোধিনী বা বোধিকার ভাষা। ব্যাকরণসম্মত পুঁথিগত শব্দের ব্যবহার, শ্রুতিসুখকর ধ্বনিবিন্যাস আবেগপূর্ণ শব্দের সাহায্যে ক্রিয়াপদের এলায়িত ভঙ্গি লৌকিক বাকভঙ্গিমাকে যথাসম্ভব পরিহার—এ ধরণের বাংলায় আমরা প্রথমে অভ্যস্ত হই। শিক্ষক মহাশয়েরা এবং বোধিনীপ্রণেতারা এ-ধরণের ভাষাতেই ছাত্রদের তৈরি করে তোলেন।

বলা বাহুল্য, এতে শুদ্ধ ভাষাব্যবহার আমরা শিখি কিন্তু এতে ভাষার নতুনতর

সম্ভাবনা সহজে গড়ে ওঠে না। শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার অর্থাৎ ভাষা-প্রকৃতিকে অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াস একটা বড় কর্তব্য অবশ্যই এবং যে-কোনো লেখকের পক্ষেই সেই সংস্কার অর্জন করা অত্যন্ত দরকার। কিন্তু ভাষার গতি ওখানেই স্তব্ধ হয়ে থাকে না। এই নিত্যচলিষ্ণু জগতে নতুন নতুন অভিজ্ঞতার থেকেই জন্ম নেয় নতুন শব্দ এবং নতুন ভঙ্গিমা। আজকাল বাংলা খবরের কাগজে আমরা যে শুধু নতুন শব্দেরই সম্মুখীন হই তা নয়, রচনার নতুনতর ভঙ্গিমাও আমাদের কৌতূহলের উদ্রেক করে। খবর পরিবেশনে নানা নাটকীয়তা এসেছে, কখনও কাব্য। সাধারণ সংবাদকে সংবাদ পরিবেশক অনেক সময়ে আবেগসিক্ত করে তোলেন। এর মধ্যে থেকেই বাংলা গদ্যের অধ্যায়ান্তর দেখা দেবে হয়তো। কিন্তু এর সবটাই যে অনুপম আদর্শ বলে গৃহীত হবে এমন কোনো গ্যারান্টি নেই। একালের দিনে ভাষাচরিত্রের একটা লক্ষণীয় বিশেষত্ব এই যে খবরের কাগজের সংবাদবাহিকা ভাষার প্রকাশ ছড়িয়ে পড়ছে। আগের যুগে বঙ্কিম রবীন্দ্র প্রভৃতি শক্তিশালী লেখকরা ভাষাপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন। তাঁদের গদ্যভাষা সংবাদপত্রেও অনুকরণ করা হয়েছে—অলংকরণ না হোক ভাষার কাঠামোকে মেনে চলেছে। একালে সংবাদপত্রের গদ্যরীতি সাহিত্য-গদ্যকে নির্মাণ করছে। প্রভাবের গতি বিপরীতমুখী। কোনো একজন লেখক—তিনি একালে সুপরিচিত লেখক—সাপ্তাহিক সাহিত্য-সংবাদে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথের গদ্যও এখন অচল হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের গদ্যের বিভিন্ন যুগ আছে। অন্তিম বয়সে তিনি যে গদ্য লিখতেন সে গদ্য সৌখিন বটে কিন্তু বাক্‌ভঙ্গিমায় কি অসামান্য শিল্পগুণান্বিত! এ-ভাষাও যদি 'আরকায়িক' মনে হয় তবে ভাষার বর্তমান অভিমুখিতা নতুন করে ভাবতে হয়। বোধহয় বিবৃতিধর্মী সংবাদপত্রীয় গদ্যই আবার সাহিত্যিক আদর্শ হবে।

যাকে বলেছি ভাষাধর্ম তার প্রতি অবহিত থাকা যে-কোনো লেখকেরই প্রাথমিক কর্তব্য। আমাদের প্রাচীন সাহিত্য-সমালোচকরা এই প্রাথমিক কর্তব্যে অবহিত করাতে গিয়েই ভাষার গুণদোষের আলোচনা করেছিলেন। তারপর বোঝা গেল সাহিত্যসৃষ্টি এবং ভাষাদক্ষতার মধ্যে আর একটি বড় স্তর আছে তাকে বলা যায় 'কম্যুনিকেশন'। সাধারণ প্রচলিত ভাষার শব্দার্থ মাত্র নিয়ে লেখকের জগৎকে পাঠকের অনুভূতিগোচর করা যায় না। তখন এল স্টাইলের ভাবনা। স্টাইল দিয়েই সাহিত্য। তার সঙ্গে ভাষাদক্ষতার প্রভেদ এখানেই যে স্টাইল লেখকের মানসিক প্রকৃতি, তাঁর ভাবগত ব্যক্তিরূপটাকে ফুটিয়ে তোলে। মানুষের অন্তর্জীবনের দুটো দিক আছে। একটি মনের আর একটি হৃদয়ের। মনের কাজ হচ্ছে বিশ্ব থেকে আহৃত তথ্যকে সুশৃঙ্খল সুবিন্যস্ত যুক্তিবদ্ধ করে দেখা। লেখকের মননশক্তি বস্তুগত তথ্যকে সুস্পষ্ট ভাষায় যখন সাজিয়ে দিতে সমর্থ হয় তখন সেই ভাষাকে অন্বর্থ ও ঋজু হতে হয়। শব্দগুলি লেখকের চিন্তাকে যথাযথভাবে ব্যক্ত করতে সমর্থ হয়। ইতিহাস, সমাজ, বিজ্ঞান, দর্শনের বিষয়

লেখকদের দৃঢ় চিন্তায় সবাক্ হয়ে ওঠে—সে-ও এক ধরনের স্টাইলের গুণে। চলতি ধারণা এই যে প্রবন্ধ জাতীয় রচনা সাহিত্য পদবাচ্য নয়, যেগুলি কল্পনামূলক বা ভাবপ্রধান রচনা মাত্র সেগুলিই সাহিত্য পর্যায়ভুক্ত হবার যোগ্য। কিন্তু মনে হয় কথাটা আংশিক সত্য মাত্র। মননপ্রধান রচনাও স্টাইলের গুণে সাহিত্য হতে পারে। ভাষার উপর লেখকের অধিকার গুণে যখন বস্তুধর্মী বিষয়টাই তাঁর অন্তরের সুনিশ্চিত বিশ্বাসে এবং প্রত্যয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তখন সেই বিষয়-প্রধান রচনাই লেখকের ব্যক্তিত্ব-প্রকাশক হয়ে ওঠে। সেও স্টাইল এবং তার মূল্য সাহিত্যে সর্বস্বীকৃত হবেই। বাংলায় অতুল গুপ্তের বা অন্নদাশঙ্করের প্রবন্ধকে এই শ্রেণীর স্টাইলের উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করা যাবে।

ব্যক্তিত্বের কথা উঠলে আরও অনেক কথাই ওঠে। বস্তুনিষ্ঠ মননধর্মী রচনাতে ব্যক্তিস্পর্শ বলতে কী বুঝব? তথ্যপ্রধান ও মননধর্মী রচনা নির্বিকার ও ভাবাবেগ-বর্জিতই হয়ে থাকে। আবার ব্যক্তিকে চেনা যায় তার স্বভাব-ধর্মে কিংবা ভাব-বৈশিষ্ট্যে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন মানুষকে চেনা যায় বাজে খরচ করার প্রবৃত্তি থেকে। কারণ কাজের খরচ সকলেরই ক্ষেত্রে একরকম ; কিন্তু বাজে খরচ করার স্পৃহা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভিন্ন। রসিক মানুষ 'বাজে খরচ' করে কবিতার বই কেনেন ; শৌখীন মানুষ আবশ্যকের চেয়ে বেশী দামী জামাকাপড় পরেন। এই ব্যক্তিস্বভাব সাহিত্যের তথ্যের পক্ষে যা প্রয়োজনীয় তার চেয়ে বেশি আবেগ বা ভাবের অতিরিক্ততায় ফুটে ওঠে। আমরা সেজন্য বলতে পারি ভাবমূলক রচনাতেই ব্যক্তিত্ব স্বভাবতই আভাসিত হয়, বিষয়মূলক রচনাতে নয়। বরং বলতে পারি বিষয় যখন লেখকের আবেগে রসসিক্ত হল তখন রচনা তার অভিপ্রেত লক্ষ্য থেকেই ভ্রষ্ট হয়। সুতরাং বিষয়-প্রধান রচনা ব্যক্তিত্বসমন্বিত হয় কী করে?

এর উত্তর দেওয়া শক্ত নয়। আমাদের মধ্যে ব্যক্তিরূপ একটি নয়। সহজ গম্ভীর, লঘু, পরিহাস-তরল, যুক্তিবাদী, কল্পনাপ্রবণ, রাগী, অভিমানী ইত্যাদি কত অসংখ্য প্রকৃতির মানুষ দেখতে পাওয়া যায়। আবার মানুষকে বিশেষ একটি বিশেষণেই অপরিবর্তনীয় অচঞ্চল একটি শ্রেণীতে বদ্ধ করে রাখা যায় না। মানুষের মেজাজ বদলাতে পারে। কিন্তু মেজাজ যে-রকমই থাক, যখন মননশীল লেখক কোনো বিষয়ের ধ্যানে মগ্ন লিপ্ত ও তদগত হয়ে যান, তখন তাঁর চিন্তা বিশ্বাসের ধ্রুবতায় সহজ সাবলীল অথচ বলিষ্ঠ দৃঢ় ও প্রত্যয়পূর্ণ হয়ে ওঠে। এই রকম রচনায় স্বচ্ছতা গাঢ়বদ্ধতা এবং সহজতা আসে। বলা বাহুল্য এ-রূপ লেখাতেও লেখকের ভাষার উপর অধিকার নিরঙ্কুশ হওয়া চাই। তিনি উপমা অলংকরণের দিকে হয়তো যাবেন না কারণ স্পষ্ট চিন্তাকে স্পষ্ট অর্থসমন্বিত ভাষাতেই প্রকাশ করে বলতে হয়। অলংকরণ একেবারে থাকবে না, তা-ও নয়। সেখানে তথ্যসমাবেশকে উপভোগ্য করার জন্য বচনভঙ্গিমা হিসাবেই তাকে গ্রহণ করব। যেমন রবীন্দ্রনাথের কালান্তরের প্রবন্ধগুলি।

আবার স্টাইল ব্যক্তিত্বদ্যোতক হয়ে ওঠে যখন বিষয় হয় কল্পনামূলক বা

ভাবমূলক। উপন্যাসে গল্পে কবিতায় লেখকের ভাষাকে আর এক দুরূহ কাজে লাগাতে হয়। বস্তুজগৎ থেকে সঞ্চিত স্মৃতিকে একটি মানসিক রূপ দিতে হয়। বাইরের জগৎ থেকে উপকরণ নিয়ে মনের মধ্যে লেখক গড়ে তোলেন একটি বিশুদ্ধ অনুভব-চিত্র। সেটাকেই ভাষায় রূপ দিতে গিয়ে লেখকের মনের মধ্যে সঞ্চিত ধ্বনি বর্ণ, রেখার যথাযথ প্রতিফলন ঘটাতে হয়। অসামান্য অনুভূতির বিশিষ্ট প্রকাশে লেখকচিত্তের তৎকালীন প্রকৃতিও আভাসে ফুটে ওঠে ভাষায়। সেখানেও স্টাইলের সার্থক দৃষ্টান্ত। লেখকের বর্ণনায় ভাবের রং লাগে, ভাষায় স্পন্দন আসে—যেন সবটাই হয়ে দাঁড়ায় প্রতীকের মতো। এ-ধরণের রচনাতেই লেখকের সততার প্রয়োজন থাকা চাই, কিন্তু সেটাই একমাত্র কথা নয়। লেখক যা অনুভব করলেন তাকে সততার সঙ্গে প্রকাশ করতে চাইলেই কি প্রকাশ করা যায়? অনুভবের মুহূর্তে ভাষার ভাণ্ডারটি লেখকের সহজ আয়ত্তে থাকা একান্ত দরকার। কল্পনার জগৎকে পূর্ণ করে লেখকের অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধ সম্পদ। শব্দভঙ্গি, বাক্‌ভঙ্গি, শব্দের মধ্যে নতুনতর চিত্রসম্ভাবনা নিয়ে আসা, উপমার দ্বারা ভাবনারূপকে ফুটিয়ে তোলা—এ-রকম নির্দিষ্ট অনির্দিষ্ট নানা মাধ্যমে শিল্পীর সৃষ্টিপ্রতিভা সক্রিয় হয়ে ওঠে। অভিজ্ঞতা যা পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা থেকে আসে, তার সাহায্য ছাড়া ভাষাসৃষ্টি করা যায় না। আবার নিছক অভিজ্ঞতাই সাহিত্য নয়। দেখবার দৃষ্টির সঙ্গে মনের জাগ্রত কৌতূহল যুক্ত হয়ে অভিজ্ঞতার মানস জগতের সৃষ্টি হয়। লেখক যা দেখেন যা শোনেন তার থেকে কৌতূহলী রূপমুগ্ধ চিত্তে উপকরণ বেছে নেন, কল্পনা আসে, উপকরণগুলি দিয়ে মনে একটা অনুভূতির অবয়ব তৈরি করে আর সেই অবয়ব অভিব্যক্তি হয় ভাষায়—যে ভাষা প্রচলিত হয়েও ভাবনান্বিত হয়ে নবজীবনে জীবন্ত। সেই ভাষাই স্টাইল যা লেখকের মানসিক অনুভূতিকে বিশেষরূপে ফুটিয়ে তোলে। কবি সুধীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন :

'অভিজ্ঞতাও প্রেরণার মতো উপান্তমাত্র ; এবং শিল্প সচেতন রূপকারের অভূতপূর্ব সৃষ্টি। অর্থাৎ শিল্পসামগ্রীর উপাদান যদিও সনাতন ও সার্বজনীন সংসারেই আহরণীয় তবু যে অসামান্য বিন্যাসে এই চিরপরিচিত উপকরণ সমূহ আমাদের বিস্ময় জাগায় তার উৎপত্তি শিল্পীর একাগ্র সংকল্পে এবং এই দিক থেকে শিল্পবস্তু আমার মতে ব্যক্তির সঙ্গে তুলনীয়।'

(*'অর্কেস্ট্রা'র ভূমিকা* ১৯৫৩)

অনুকরণবাদ

সাহিত্য অনুকরণ না সৃষ্টি এই নিয়ে এক তর্ক আছে। এ তর্ক অবশ্য পুরনো কিন্তু তার মীমাংসা যে হয়েছে তা বলা যায় না। অবশ্য সাহিত্যের কোনো প্রশ্নেরই কখনও সর্বজনসম্মত মীমাংসা হয় না। এক-একটা বিষয় নিয়ে দীর্ঘকাল আলোচনা চলে। তাতে অবশ্য যথেষ্ট লাভ আছে। অর্থাৎ বিষয়টাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করা যায়, নানা নিহিত তাৎপর্য বেরিয়ে আসে, নানা পথের সন্ধান মেলে কিন্তু মূল সমস্যাটা ঠিক থেকেই যায় বলা না গেলেও তার সর্বজনস্বীকৃত সমাধান পাওয়া যায় না। তার কারণ যাঁরা এ-সব প্রশ্ন তোলেন তারা সাহিত্যরসিক বলেই কিছু না কিছু রস-সত্যকে অনুভব করেন। সে জন্য এ-পক্ষ ও-পক্ষ দু-পক্ষেই কিছু না কিছু সাহিত্য-সত্য থাকে। হয়তো দুয়ে মিলেই পূর্ণ সত্য।

যাঁরা বলেন সাহিত্য জীবনের অনুকরণ তাঁদের প্রতিবাদ করেছেন তাঁরা, যাঁরা বলেন সাহিত্য অনুকরণ নয় নতুন সৃষ্টি। দু-দলই সাহিত্যরসজ্ঞ জিজ্ঞাসু। দু-দলেরই বিশ্বাসকে আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি না। এ তো আর অঙ্কের সত্য নয় যে একটা অঙ্ককে ভুল প্রমাণ করে নতুন অঙ্ক তৈরি করবেন গণিতবিদ। অথবা ভাবতে বিস্ময় লাগে বিজ্ঞানেও তত্ত্ব আর ইন্দ্রিয়গত সত্য এক নয়। আসলে দুয়ের মধ্যেই সত্য থাকে। ইউক্লিডের জগৎ আর আইনস্টাইনের জগৎ তো এক নয়। কিন্তু তবুও এক না হলেও কার্যত এক। যেমন—

The Einstein universe therefore is non-Euclidean and finite. To earthbound man a light ray may appear to travel in a straight line to infinity, just as to an earthworm crawling "straight" ahead forever and ever the earth may seem both flat and infinite. But man's impression that the universe is Euclidean in character, like the earthwörm's impression of the earth, is imparted by the limitations of his senses. In the Einstein universe there are no straight lines, there are only great circles. Space, though finite is unbounded ; a mathematician would describe its geometrical character as the four-dimensional analogue of the surface of a sphere.

—Lincoln Barnett, The Universe and Dr. Einstein (Mentor, 1959) p. 96-97.

ইন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধতা আমাদের যে জগতের সম্মুখবর্তী করে দেয় তাই দিয়ে আমাদের এতদিন চলে এসেছে। ভবিষ্যতেও চলবে। আইনস্টাইন যে জগৎ আবিস্কার করলেন তত্ত্বত হয়তো তাই সত্য কিন্তু ইউক্লিডের জগৎকেই বা মিথ্যা বলি কি করে? একটাকে বলা যায় ইন্দ্রিয়ের সত্য আর একটাকে বলা যায় বুদ্ধির সত্য। ইন্দ্রিয়ের সত্য দিয়েই আমাদের নিত্যকার কাজ।

সাহিত্যিক অনুকরণ করেন কোন্ সত্যটি, এই তত্ত্বের সত্যকে না ইন্দ্রিয়ের

সত্যকে? যিনি এই অনুকরণ তত্ত্বটির সূত্রপাত করেছিলেন, তিনি যে-কালের মানুষ সেকালে মানুষ বৈজ্ঞানিকের ইন্দ্রিয়াতীত জগতের সন্ধান পাননি। সন্ধান পাওয়া গেলেও সাহিত্য তো সেই তত্ত্বের কোনো রূপসৃষ্টি করতে পারবে না। সাহিত্যকে আমাদের ইন্দ্রিয়-জগতের স্মৃতি দিয়ে গল্প, নাটক, কবিতা রচনা করে তুলতে হয়। অন্তত সেকালের সাহিত্য-তাত্ত্বিক সেই কথাই বিশ্বাস করতেন। ইন্দ্রিয়-জগতে যা ঘটে সাহিত্যের কাহিনীতেও সেই রকম করেই ঘটনা ঘটাতে হবে, সাহিত্যের চরিত্রকে সেই রকম করেই আচরণ করতে হবে, সেই রকম করেই দুঃখ বেদনা ও সুখকে, চরিত্রের অনুভূতিগুলোকে দেখিয়ে দিতে হবে। লিরিক কবি যখন কবিতা লেখেন তখন বিশ্বপ্রকৃতিকেও তেমনি করেই ফুটিয়ে তুলতে হবে যেমন করে একজন দর্শক বা শ্রোতার কাছে সেই প্রকৃতি প্রকাশিত হয়।

এভাবে অনুকরণ করে যাওয়ার একটা আনন্দ আছে। ফলে চর্মচক্ষুতে যা দেখি ঠিক তা যদি কতকগুলি অর্থযুক্ত শব্দপাঠের ফলে দেখতে পাই তবে স্বভাবতই একটা বিস্ময় জন্মে। এটা একটা কঠিন কাজ। একজন বালক একটা পুতুল গড়তে পারে মানুষের মত চোখমুখ হাত পা দিয়ে কিন্তু তাকে ভাবপ্রকাশক করতে উচ্চতর নৈপুণ্য চাই। একজন বেদনার্ত মানুষের বেদনাকে মুখে ফুটিয়ে তোলা বড়ো সহজ কথা নয়। বহু বছর পরে দেখা হওয়া দুই বন্ধুর স্নিগ্ধ আনন্দকে মুখে ফুটিয়ে তোলা কি কেবল অনুকরণ-পটুতায় সম্ভব? অ্যারিস্টটল যখন সাহিত্যকে অনুকরণাত্মক বলেছিলেন তখন অনুকরণের এই উচ্চতর শক্তিকে তর্কাতীত বলেই বোধহয় এ বিষয়ে তিনি আর কোনো স্তরভেদ করেননি। শিশুর অনুকরণ আর শক্তিমানের অনুকরণে নিশ্চয়ই প্রভেদ আছে। সাহিত্য শক্তিমান লেখককৃত অনুকরণ—কিন্তু অনুকরণই অর্থাৎ এতে এমন কোনো বিবরণ থাকবে না যা বাস্তব-প্রকৃতিতে নেই।

শক্তিমান লেখকের এই অনুকরণ-ক্ষমতাকে মেনে নিয়েও জিজ্ঞাসুর সব প্রশ্নের উত্তর মেলে না। অ্যারিস্টটল এ-বিষয়ে সচেতন ছিলেন। তাই ইতিহাস আর কাব্যের মধ্যে তিনি পার্থক্য দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন কাব্যে থাকে উচ্চতর সত্য, আর ইতিহাসে থাকে বিশেষিত সত্য। তাঁর মতে অনুকরণ মানুষের ক্রিয়া-কর্মের। কিন্তু শুধু ক্রিয়া-কর্মের অনুকরণে ইতিহাস হতে পারে, কাব্য হয় না। এজন্য মনে হয় তিনি জানতেন অনুকরণ বস্তুত বাইরের ক্রিয়ার নয়, অন্তরের রূপের। অনুকরণ যদি অন্তরের হয়, তবে সে কি রকম? কোনো কোনো সমালোচক এর থেকে এই সিদ্ধান্ত করেন যে, চরিত্র ও ঘটনার কার্যকারণগত যোগের ভিতরে আছে এক নির্বিশেষ সত্য। এই নির্বিশেষ সত্যটির অনুকরণই লেখকের কাজ। ইতিহাসের সবিশেষ সত্যের অনুকরণ লেখকের কাজ নয়। নির্বিশেষ সত্যের ধারণা দ্বারা স্থানে ও কালে সীমাবদ্ধ ঘটনাকে নিত্য অর্থে ব্যঞ্জিত করে তোলা যায়। যারা এ-ধরণের ব্যাখ্যার পক্ষপাতী তাঁরা সাহিত্যের অনুকৃতিকে আর এক অর্থে নিয়ে যাওয়ার পথ তৈরি করে দিলেন। তাঁদের ব্যাখ্যায় ঘটনা

একটা নিত্যকালীন সত্যের প্রতীক মাত্র। বুচার সাহেব বলছেন it is a rivalry of nature, a completion of her unfulfilled purposes, a correction of her failures.

প্রকৃতিতে যা অপূর্ণ সাহিত্যে তাই পূর্ণ হয়ে ওঠে, জগতে যা অচরিতার্থ সাহিত্যে তাই চরিতার্থ—এর সঙ্গে অনুকরণ-সম্পর্ক কতটুকু? এতো অনুকরণ হল না, এ তো হল সংশোধন। অনুকরণ বলতে বুঝব প্রকৃতির অপূর্ণতা অচরিতার্থতাকেও সাহিত্যে ফুটিয়ে তোলা। দ্বিতীয়ত, প্রকৃতিকে অপূর্ণ বললে স্বভাবতই পূর্ণতার একটি স্বনির্মিত মানসিক আদর্শ স্বীকার্য হয়ে পড়ে। তাতে অবশ্য সাহিত্যের অনুকরণমূলক হতে বাধা নেই। লেখক মনে একটি আদর্শবাদী প্রেরণা থেকেই সৃষ্টির অপূর্ণতাকে রূপ দেবেন। দুঃখ বেদনা মৃত্যু গ্লানি—এ-সবের অতীত একটি সুন্দরের ধারণা মনে রেখে তারই মাপকাঠিতে জগৎকে অনুকরণ করবেন ভাষায়, যাতে অপূর্ণতার বোধ পাঠক-মনে সঞ্চারিত হয়। সে রকম ক্ষেত্রে অনুকরণের মূলেও থাকে আদর্শবাদ। আমাদের উপস্থিত আলোচ্য কিন্তু ঠিক তা নয়। লেখকের মনের প্রেরণা সবই, সাহিত্য কি বহির্ঘটনার অন্তঃস্বরূপের অনুকরণ? এই অন্তঃস্বরূপটি কি?

যদি 'অনুকরণ' কথাটিই আক্ষরিক অর্থে মেনে নিই, তা হলে অন্তরস্বরূপের অনুকরণ হয় না, হয় উদঘাটন। অনুকরণ করা যায় বাইরের বস্তু বা ক্রিয়াকে। মানুষের প্রবৃত্তিকেও তার অন্তর্গত করে নেব। অথচ একে হতে হবে নির্বিশেষ সত্য। বস্তুর অন্তঃস্বরূপ কি নির্বিশেষ সত্যের আভাস দেয়? বিশুদ্ধ অনুকরণবাদীরা কিন্তু অন্তঃস্বরূপ বলতে কোনো আইডিয়াকে বুঝবেন না। তাঁরা বোঝেন যে-বস্তু অনুকার্য, সে-বস্তুতে নিহিত কোনো অমোঘ প্রাকৃতিক নীতিকে আবিষ্কার। আধুনিক কালে আমরা যাকে মন্ময় আদর্শবাদিতা বলি, কবির ভাষায়

> আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ
> চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
> আমি চোখ মেললুম আকাশে—
> জ্বলে উঠল আলো।

সেই আত্মকেন্দ্রিক ভাববাদ অনুকরণবাদের বিপরীত। লেখক তাঁর চেতনায় বস্তুরূপকে গড়ে নেবেন—এ তত্ত্ব বহু পরবর্তী। এই চেতনার দ্বারা অন্তঃস্বরূপকে উদঘাটন করা চলে, অনুকরণ করা যায় না। কিংবা একে বলা যায় 'সৃষ্টি'। বস্তুকে নিজের চেতনায় নতুন করে গড়ে নেওয়া। অ্যারিস্টটল একথা বলেননি। বস্তুর বস্তুত্ব রক্ষা করে তাদের মধ্যে অর্থপূর্ণ যোগাযোগ দেখিয়ে একটি সমগ্রতার রূপ দেওয়ার দায়িত্ব তিনি দিয়েছেন কবিদের। বাইরের জগতে আমরা কয়েকটা ঘটনা দেখলাম, সেই ঘটনাগুলির মধ্যে সম্ভাব্যতার কার্যকারণযোগ স্পষ্ট করে তোলা গেলে সেটা একটা কাহিনীর রূপ পায়। সম্ভাব্যতার এই যোগের নাম অ্যারিস্টটল দিয়েছিলেন অভিধানে যার অর্থ হয়, The irresistible law conceived to

prevail through the material universe and govern all human action often physical. আমাদের সংস্কৃতে তার নাম নিয়তি।

পাশ্চাত্যের প্রাচীনতম সমালোচনা-দর্শনে সাহিত্যের এই বস্তুটি উদ্ভাবিত হয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে এই অনুকরণবাদ এমন কিছু জটিল তত্ত্ব নয়। প্রাচীন কাব্য প্রাচীন নাটক যেমন মানব-সভ্যতার আদিম পর্যায়ের সরল অভিব্যক্তি, এই তত্ত্বটিও তেমনি বস্তুজগতের ঘটনাধারার সাহিত্যরূপ পাওয়ার একটি সরল তত্ত্ব। আশ্চর্যের বিষয়, তত্ত্বটি সরল হতে পারে কিন্তু অত্যন্ত শক্তিশালী। কেননা অনুকরণবাদ শুধু গ্রীক সাহিত্যের বা গ্রীক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রাসঙ্গিক নয়, এর সারবত্তা পরবর্তী য়ুরোপীয় মানসিকতা এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রেও অটুট। যে-জাতি জীবন-সত্যকে মূলত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপরসের বস্তু বলে জেনেছে, তাদের কাছে অনু-করণবাদটাই সব সাহিত্যবোধের ভিত্তি হয়ে থাকবে তাতে আর বিস্ময়ের কি? প্রাচীন গ্রীক মূর্তিকলা থেকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত, রোমান্টিক যুগের পূর্ব পর্যন্ত, অনুকরণের ভিত্তিতেই য়ুরোপীয় সাহিত্য ও শিল্প রচিত হয়ে এসেছে। ব্রাডলির মতো ভাববাদী সমালোচক শেক্সপীয়রের নাট্যচরিত্রের জীবন্ততা অর্থাৎ জীবনানু-গামিতা দেখাতেই তাঁর সুবিখ্যাত সমালোচনা-গ্রন্থখানি লিখেছেন। এতে শুধু শেক্সপীয়রের যুগ নয় ব্র্যাডলির সময়ের প্রচলিত সাহিত্য-সমালোচনার মানদণ্ডটি বোঝা যায় ; সেটি জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখারই প্রবণতা।

অবশ্য অনুকরণতত্ত্বটি, বলাই বাহুল্য, আদিতে যে ভাবে পরিকল্পিত হয়েছে, ঠিক তেমনি ভাবেই প্রযোজ্য হতে পারে না। অ্যারিস্টটলের বক্তব্যের ভাবতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করে কেউ কেউ অনুকরণবাদের মধ্যে আদর্শবাদ নিয়ে আসতে চেয়েছেন এ-কথা আগেই বলেছি। এটা অ্যারিস্টটলের অভিপ্রেত ছিল না, এটাও প্রমাণ করতে চেয়েছেন সাহিত্য-পণ্ডিতেরা। কেননা দেখা গেল তিনি লেখক ব্যক্তির সেই সংহত একমুখী কল্পনাশক্তির কথা ভাবেননি, যে কল্পনা দিয়ে এমন কিছু গড়ে তোলা যায় যাকে অনুকরণ বলা যায় না। যে-হ্যামলেট বলে···This most excellent canopy the air, look you, this brave o'erhanging firmament, this majestical roof fretted with golden fire—why, it appeareth no other thing to me than a• foul and pestilent congregation of vapours. What a piece of work is man! How noble in reasosn! how infinite in faculties! in form and moving, how express and admirable! in action, how like an angel! in apprehension how like a god! the beauty of the world! the paragon of animals! And yet to me what is this quintessence of dust ?

বিস্ময় এবং বেদনার, সৌন্দর্যবোধ এবং যন্ত্রণার মিশ্রণে কল্পিত এই আশ্চর্য চরিত্র কি অনুকরণ না মহাকবির সৃষ্টি? এতে অ্যারিস্টটল-কথিত 'ল অব নেসেসিটি' আছে, কিন্তু শুধু তাতেই কি এই চরিত্রটির ব্যাখ্যা সমাপ্ত হয়? এই চরিত্র-বিশেষত্ব কবির মনে এসেছিল কেবল কয়েকটি বহির্জাগতিক

উপকরণের অনুকরণে নয়, তাঁর নিজের কল্পনা দিয়ে এই চরিত্রটি এবং এই মুহূর্তটিকে সৃষ্টি করে নিয়েছেন। একথা না মেনে উপায় নেই তবু এ-কথাই বা অস্বীকার করব কী করে যে হ্যামলেট চরিত্রটির মূলে রয়েছে এই বাস্তব অস্তিত্বেরই কঠিন সমস্যা। যে-বিচিত্র জালে সে জড়িয়ে পড়েছে তার নাম নিয়তি, অমোঘ দুর্ভেদ্য সম্ভাব্য ঘটনাজাল। পরবর্তী রোমান্টিক যুগে কল্পনার অবারিত মহিমায় বাস্তবানুকরণ ম্লান হয়ে গেল, এল সৃষ্টির তত্ত্ব কিন্তু য়ুরোপীয় জীবনদৃষ্টি এবং সাহিত্য মূলত বাস্তবকে কোনোদিনই অস্বীকার একেবারে করতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ একথা বলেছিলেন:

যে জাতি খণ্ডসত্যকে প্রাধান্য দেন, যাঁহারা বাস্তবসত্যের অনুসরণে ক্লান্তি বোধ করেন না, কাব্যকে যাঁহারা প্রকৃতির দর্পণমাত্র বলেন, তাঁহারা জগতে অনেক কাজ করিতেছেন—তাঁহারা বিশেষ ভাবে ধন্য হইয়াছেন—মানবজাতি তাঁহাদের কাছে ঋণী।

এ সেই ইউরোপীয় সাহিত্যেরই কথা। কল্পনার বর্ণবিন্যাস আত্মকেন্দ্রিক মগ্নতা, আদর্শবাদীর পরিমার্জনা, সাহিত্যের বিষয়ধর্মে যে পরিবর্তনই আনুক অনুকরণ-তত্ত্বটি আধুনিক দৃষ্টিতে যতই অর্থহীন হয়ে যাক জীবনের বাস্তব ভিত্তি থেকে কখনোই সে-সাহিত্য স্খলিত হয়নি। এই অনুকরণবাদের নানা পরিবর্তন হয়েছে, শেষ পর্যন্ত রিয়ালিজম্ নামক বস্তুতন্ত্রী সাহিত্যরীতিও সেই সাহিত্যিক সংস্কৃতিতে স্বাভাবিক রূপেই দেখা দিয়েছে। তার আগে যে রোমান্টিক যুগ এসেছিল তাতে কল্পনার আতিশয্য সত্ত্বেও পারিপার্শ্বিক জগৎ, আমাদের প্রতিবেশী, প্রকৃতির রূপরস আনন্দ বিষাদ, অকৃত্রিম বিশুদ্ধতা নিয়েই সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে।

একথা মনে হতেই পারে যে সাহিত্যে কোনো না কোনো ভাবে জীবনই তো থাকবে। জীবন ছাড়া সাহিত্য হবে কি করে? কিন্তু সাহিত্য নিয়ে নানা দৃষ্টিভঙ্গি আছে। কেউ মনে করেন সাহিত্যে আমরা জীবনকেই ফিরে পাচ্ছি, কেউ মনে করেন জীবনে আমরা যা পাই না সাহিত্যে আমরা তাই পাই, এই জন্যই সাহিত্যের প্রয়োজন। কেউ বলেন সাহিত্যের একটা আলাদা জগৎ, তার নিয়ম-কানুন তার নিজের, আমাদেব বাস্তব নীতিনিয়ম দিয়ে তার বিচাব চলে না। এসব বিভিন্ন মত কোনোটাই একেবারে অসার নয়। তথাপি সাহিত্য জীবনের অনুকরণ নয়, এই মতটারও একটা বিশিষ্ট পশ্চাদ্‌ভূমি আছে এ-কথাও বলা দরকার। এটা দরকার এই জন্যে যে আজকালও যাঁরা এই মতে বিশ্বাস করেন তাঁরাও অনুকরণবাদের গোড়ার প্রভাব থেকে একেবারে মুক্ত নিশ্চয় নন। আধুনিক কবিতা বা আধুনিক উপন্যাসের রীতিনীতি শৈলী প্রতিক্রিয়া কিছুই পোয়েটিকসের নির্দেশের সঙ্গে মিলবে না, উনিশ শতকের সাহিত্যতত্ত্বের সঙ্গেও মিলবে কিনা সন্দেহ, তবু বলতে দ্বিধা নেই যে এই সাহিত্যও জীবনোদ্ভুত।

সত্যি সত্যিই অনুকরণবাদের সঙ্গে মিল নেই, এ রকম কোনো দৃষ্টান্ত যদি খুঁজতে হয় তবে তা পাওয়া যাবে আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথের থেকে

যে উদ্‌ধৃতি দেওয়া হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ নয়। তার অবশিষ্ট হচ্ছে—

'অন্যদিক যাঁহারা বলিয়াছেন "ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" যাঁহারা পরিপূর্ণ পরিণামের মধ্যে সমস্ত খণ্ডতার সুষমা সমস্ত বিরোধের শান্তি উপলব্ধি করিবার জন্য সাধনা করিয়াছেন তাঁহাদেরও ঋণ কোনোকালে পরিশোধ হইবার নহে।'

সকলেই বুঝতে পারছেন পূর্বের উদ্ধৃতিতে রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়েছিলেন য়ুরোপীয় জাতি এবং সাহিত্যের কথা, এই উদ্ধৃতাংশে বুঝিয়েছেন ভারতীয় জাতি এবং সংস্কৃত সাহিত্যের কথা। 'সমস্ত খণ্ডতার সুষমা সমস্ত বিরোধের শান্তি' উপলব্ধি করবার জন্য যে-জীবনের অনুপ্রেরণা চাই, সে-জীবন আমাদের এই ব্যথাদীর্ণ মৃত্যুম্লান, নৈরাশ্যপীড়িত, ক্ষণহাস্যোজ্জ্বল জীবন নয়, সে-জীবন একটা পরম বিশ্বাস মহৎ তৃপ্তি এবং প্রশ্নহীন প্রাপ্তির জীবন। আমাদের রসশাস্ত্রে সাহিত্যের প্রসঙ্গে জীবনের কথা নেই, আছে রসের কথা যে রস অনির্বচনীয় ব্রহ্মাস্বাদতুল্য। ব্রহ্মাস্বাদের সঙ্গে তুলনার তাৎপর্য এই যে এতে জীবনের বিক্ষোভ অশান্তি পীড়ন থাকে না। অতএব এ-সাহিত্য অনুকরণের সাহিত্য নয়। কাব্যপ্রকাশের রসবেত্তা তো স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন :

নিয়তিকৃতনিয়মরহিতাং হ্লাদৈকময়ীমনন্যপরতন্ত্রাং।
নবরসরুচিরাং নির্মিতিমাদধাতী ভারতী কবের্জয়তি॥

বলেছেন, সাহিত্য 'নিয়তিকৃতনিয়মরহিত'— অর্থাৎ অনুকরণের ঠিক বিপরীত। অ্যারিস্টটল বললেন সাহিত্যে নিয়তিরই নিয়মসূত্রের বিধান, সংস্কৃত কাব্যতাত্ত্বিক বলছেন নিয়তির নিয়ম থেকে মুক্ত থেকে নবরসে রুচির এই কাব্য। রসসৃষ্টির জন্য নিয়তির বন্ধনের প্রয়োজন নেই, প্রকৃতির অনুকরণ বরং বাধা। কেননা প্রকৃতিতে রসের প্রশান্তি আসতে পারে এমন কিছু নেই। সে জাগায় দুঃখ, অপূর্ণতার বোধ আর বিক্ষোভ।

তবু শকুন্তলা দুষ্মন্তের প্রেম কি জীবন থেকে নেওয়া নয়? প্রেমে সংশয় দ্বন্দ্ব কি জীবনেরই ঘটনা নয়? সুতরাং বলা যেতে পারে মুলত সংস্কৃত কাব্যনাটকও জীবনেরই অনুকরণ। কিন্তু এটা আপাতসত্য মাত্র। অভিজ্ঞান শকুন্তলমের ঘটনা নিয়তি-চালিত ঘটনা নয়, ধর্ম-চালিত ঘটনা। 'ধর্মেণাপি পদং শর্বে কারিতে পার্বতীং প্রতি'। ধর্মই মহাদেবের মনকে পার্বতীর প্রতি আকর্ষণ করেছে—এই ঘটনা কুমারসম্ভবেরও। নাটকের বাস্তব-সম্ভাব্যতা নিয়ে মল্লিনাথেরা কখনও প্রশ্ন তোলেননি, তাঁরা বিশ্লেষণ করেছেন আলম্বন উদ্দীপনজাত রসকে। এ জন্য ঘটনা-সূত্রে সম্ভাব্যতা থেকে হামেশাই বিচ্যুতি ঘটলে কিছুই এসে যায় না। বরং বিচ্যুতিই প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আমাদের মূর্তিকলাতে যেমন আমাদের সাহিত্যেও তেমনি এর অজস্র নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। বেহুলা স্বর্গলোক থেকে লখিন্দরকে ফিরিয়ে নিয়ে এল, এতে বাস্তবের অনুকরণ নেই কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেমন শকুন্তলার প্রসঙ্গে বলেছেন, সে-বক্তব্য এখানেও প্রযোজ্য—

অতিথি প্রতিবেশীর মধ্যে বিচিত্র সৌভাগ্যরূপে ব্যাপ্ত হইয়া না যায়।'

নাট্যরীতির আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ ইয়োরোপীয় নাট্যরীতির তুলনা করেছেন এবং স্পষ্টতই সংস্কৃত নাটকের স্বাতন্ত্র্য দেখিয়ে নাট্যরীতির দিক দিয়ে এর ত্রুটির সমর্থন করেছিলেন। এতে প্রাচীন কবির বক্তব্য এবং দৃষ্টিভঙ্গিই প্রধান। সে-বক্তব্য প্রকাশ হয়েছে কি রীতিতে—তার যথাযথতা রবীন্দ্রনাথের সমালোচ্য হয়নি। এখানে বিষয়টা যদি আর একটু চিন্তা করে দেখা যায়, তবে বোঝা কঠিন হবে না সাহিত্যের এই বিচার-পদ্ধতির সঙ্গে উনিশ শতকীয় সাহিত্যধারার যোগ আছে। প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে গৌরববোধ এবং সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গে জীবনের গভীর ও অচ্ছেদ্য যোগ—এ দুইই সেকালের চিন্তার বৈশিষ্ট্য। সাহিত্য তখন ছিল সামাজিক নিয়মের ফল। সুতরাং সাহিত্যের মধ্যে সামাজিক কল্যাণ ও শুভকে প্রকাশ করতেই হবে। এ দিক থেকে সাহিত্যসমালোচনা ও সমাজসমালোচনা প্রায় সমার্থক। উনিশ শতকে সাহিত্যকে সার্থক বলা হত যদি তাতে সমাজভাবনা প্রতিফলিত হত। বলা বাহুল্য, মার্কসীয় পদ্ধতির সঙ্গে এর পার্থক্য এই যে, এই সমাজচিন্তায় শ্রেণীসংগ্রাম এবং অর্থনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতেই ভাবজগতের রচনা-তত্ত্ব বড়ো হয়ে ওঠেনি। সমাজজীবনের আদর্শ ও নীতিতে সাহিত্য আবিষ্কার করা অথবা সাহিত্যকে তারই উপযুক্ত প্রকাশরূপে ব্যাখ্যা করা ছিল সেকালের সমালোচনা।

'আধুনিক সাহিত্য' নামে রবীন্দ্রনাথের বইতে সমালোচনার পদ্ধতি কিছু আলাদা। পরিবেশের সঙ্গে সাহিত্যের নিবিড় অন্তর্নিহিত যোগ দেখানোর চেষ্টা এতে নেই। সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ অনেকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ সৃষ্টি হিসাবে দেখেছেন। এর সার্থকতা হচ্ছে এর নিজস্ব সঙ্গতিকে নির্দেশ করা। সাহিত্যের জগৎ একটা আলাদা জগৎ, যদিও সেটা বস্তুজগতের মতো কতকগুলি বাস্তব যুক্তি ও ধর্মের শাসনে গঠিত ও চালিত তবু সমাজের, প্রতিফলনে নয়, সাহিত্যের নিজস্ব রীতি পদ্ধতি দিয়েই একে বিচার করতে হবে। সমাজের সঙ্গে এর সমীকরণ করলে সাহিত্যরসাস্বাদন হয় না। রাজসিংহের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ বলছেন :

'সেইজন্য রাজসিংহ প্রথম পড়িতে পড়িতে মনে হয় সহসা এই উপন্যাস-জগৎ হইতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব যেন অনেকটা হ্রাস হইয়া গিয়াছে। আমাদিগকে যেখানে কষ্টে চলিতে হয় এই উপন্যাসের লোকেরা সেখানে লাফাইয়া চলিতে পারে। সংসারে আমরা চিন্তা শঙ্কা সংশয়-ভারে ভারাক্রান্ত, কার্যক্ষেত্রে সর্বদাই দ্বিধাপরায়ণ মনের বোঝাটা বহিয়া বেড়াইতে হয়—কিন্তু রাজসিংহ-জগতের অধিকাংশ লোকের যেন আপনার ভার নাই।'

কিন্তু এটাকে উপন্যাসের দোষ হিসাবে গণ্য না করে রবীন্দ্রনাথ একে রাজসিংহ-জগতের নিজস্ব নিয়ম হিসাবেই দেখেছেন। উপন্যাসের সার্থকতা এই নিজস্ব নিয়মের অনুসরণে। ইতিহাস-সত্যের সঙ্গে মিলল কিনা কিংবা বাস্তবসমাজের সঙ্গে মিলল কিনা—এ-ভাবনায় এই সমালোচনা দ্বিধাগ্রস্ত নয়।

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাতেই আমরা এই দুই রীতির দেখা পাচ্ছি। অবশ্য এ দুই রীতি তাঁর লেখাতেই প্রথম দেখা গেল এ কথা বলা ঠিক হয় তো হবে না। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখাতেই আমরা দু-রকমের আদর্শের দেখা পাই। তাঁর বিদ্যাপতি জয়দেব রচনাটিতে সাহিত্যকে তিনি বর্ণনা করেছেন 'নিয়মের ফল' বলে। জাতি ও সমাজে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, ঐতিহাসিক কারণে সাহিত্য গড়ে ওঠে সেই অবস্থারই সৃষ্টি রূপে। বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাসী ছিলেন প্রাকৃতিক নিয়ম-তত্ত্বে। তিনি সাহিত্যের উদ্ভবের কারণ দেখিয়েছেন কতকগুলি বাস্তব পরিবেশে। সে-ক্ষেত্রে সাহিত্যে কল্যাণ বা নীতি আলাদা কিছু হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কারণ জীবন যে ভাবে গড়ে দেবে সাহিত্য সেভাবেই গড়ে উঠবে। বঙ্কিমের এঁই ব্যাখ্যা যেন বিশুদ্ধ রসসমালোচনা নয়। পাঠককে এই পদ্ধতিতে রসাস্বাদন করানো যায় না—শুধু সাহিত্যসৃষ্টির কারণটি বুঝিয়ে দেওয়া যায় মাত্র।

কিন্তু বঙ্কিম এইটুকুই করেননি। উত্তররামচরিতের যে বিখ্যাত সমালোচনা বঙ্কিম করেছিলেন, তাতে তাঁর পদ্ধতি ছিল স্বতন্ত্র। উত্তরচরিতের সমালোচনায় কাহিনীর অনুসরণ-প্রসঙ্গে এর ভাবের দিকটি বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। বঙ্কিমের এই সমালোচনাটিকে বলা যেতে পারে জীবনানুগামী অর্থাৎ বাস্তব জীবনে মানবহৃদয় ও মানবচরিত্রের যে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়, তারই কষ্টিপাথরে তিনি কবির সৃষ্টির আলোচনা করেছেন। তাঁর শকুন্তলা-মিরান্দা-ডেসডিমোনা প্রবন্ধটিও এই পদ্ধ তিতে রচিত। জীবননীতির মানদণ্ডে সাহিত্যের সৌন্দর্যকে তিনি উদ্‌ঘাটিত করেছেন। বঙ্কিমের মতে সাহিত্যের জগৎটা স্বাধীন নয়—জীবননির্ভর। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায় ভারতীয় কালচারের আলোকে সাহিত্যালোচনা করেছিলেন। বঙ্কিম এদিক দিয়ে ইংরেজি শিক্ষা ও সাহিত্যে নব্য দীক্ষিতের রসবোধ দিয়ে বিচার করেছেন। তখন পর্যন্ত সমালোচনার যে-প্যাটার্ন চল্‌তি ছিল ইংরেজি সাহিত্যে, তিনি তাকেই অনুসরণ করেছেন।

লক্ষ্য করলে বোঝা যায় এই শতকের তৃতীয় দশক থেকেই বাংলা সমালোচনার ঁ-পদ্ধ তিতে পরিবর্তন এসেছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে যে ভাবে সমালোচনা করেচিলেন, সে-পদ্ধতি সকলে অনুসরণ করতে পারেননি। আগের যুগের আদর্শের জের তখনও চলেছিল। তাই রবীন্দ্র-সাহিত্য নিয়ে সংশয়-সন্দেহের শেষ তখনও হয়নি। অজিত চক্রবর্তী ব্যক্তিকে অবলম্বন করে সাহিত্য-বিচারের রীতি প্রবর্তন করলেন—এ রীতিও রবীন্দ্র-প্রবর্তিত নয়। তবে অজিত চক্রবর্তীর রীতি বাংলা সমালোচনায় বেশ শক্তিশালী হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ জীবনদেবতা তত্ত্বের অবতারণা করলে তারই সমর্থনে ব্যক্তিব্যাখ্যামূলক সমালোচনাপদ্ধতি গড়ে ওঠে। 'ভারতী' 'প্রবাসী' প্রভৃতি পত্রিকায় নতুন কবিতা তৈরি হল রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে, তার আলোচনা ব্যক্তিকে বোঝবার চেষ্টা ছাড়া সার্থক হতে পারে না।

তৃতীয় দশক থেকে এরই সঙ্গে দেখা দিয়েছে আর এক রীতি—আর্ট-সর্বস্ব

সমালোচনার রীতি। একে অবশ্য সম্পূর্ণ আলাদা করে বলা যায় না। ব্যক্তিসর্বস্বতা ও আর্টসর্বস্বতা বস্তুত একই জিনিসের দু-দিক। নিজের অন্তরের তাগিদ থেকে যার সৃষ্টি কোনো নীতিনিয়মের প্রতিই তার বাধ্যবাধকতা থাকে না। কল্লোল-কালিকলম-প্রগতির লেখকরা সাহিত্যে যে আদর্শকে ফলবান্ করে তুলেছিলেন, তার জন্য এই নতুন সমালোচনারীতির প্রয়োজন ছিল। মোহিতলাল কবিতা-চর্চার শেষ যুগে এসে পৌঁছেছেন, সমালোচনা তত্ত্বের দিকে ঝুঁকেছেন। মোহিতলালও সৌন্দর্যবাদী সমালোচক। তিনি বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন গত শতাব্দীর শেষের দিকের ইংরেজি সাহিত্যসমালোচনার আদর্শ দিয়ে। বিশেষ করে ক্রোচের প্রকাশবাদের সঙ্গে ভিকটোরিয়া যুগের মধুর শব্দরচনার প্রবৃত্তিকে মিশিয়ে সাহিত্যের স্টাইলের একটি তত্ত্ব গড়ে তুলেছিলেন। মোহিতলাল একটি প্রবন্ধে বলেছেন:

'সাহিত্যের যদি কোনো বিধি বিধান বা নীতিশাস্ত্র থাকে তবে তাহা মুক্ত প্রাণের নীতি। ভাল-মন্দ, লাভ-ক্ষতি, স্বর্গ-নরক প্রভৃতির হিসাব করিয়া মানুষ সমাজনীতি ধর্মনীতি প্রভৃতি যাহা কিছু গড়িয়া তোলে—এই নীতি তাহা হইতে স্বতন্ত্র। রাষ্ট্রে বা সমাজে নয়—বৃহত্তর জগতে মানুষের মনুষ্যত্ব যে সত্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাহারই ছন্দানুবর্তন সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-প্রেরণায় লক্ষিত হয়।'

মোহিতলাল সাহিত্যকে আর্টবাদীদের মতো বহির্জগতের নীতিনিয়মের থেকে মুক্ত ও স্বাধীন অনুপ্রেরণাজাত বলেই বর্ণনা করেছেন। তাঁর এই সমালোচনার আদর্শ যে বাংলায় ফলপ্রসূ হয়েছে তা স্বীকার করতে বাধা নেই। আর কিছু না হোক আমাদের সরকারী সমালোচনা অর্থাৎ শিক্ষালয়ের সমালোচনা যে এই পথেই চলে আসছে, সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এই পদ্ধতি নিয়ে আমাদের অসুবিধায় পড়তে হয় না, বরং গভীরতারই সন্ধান পাই, তার কারণ আমাদের পঠনীয় সাহিত্য গ্রন্থগুলি এখন পর্যন্ত পূর্ব যুগের।

কিন্তু সাহিত্যের আদর্শ যেমন পালটায় সমালোচনার আদর্শও তেমনি পালটায়। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের অনুসরণে সাহিত্য তৈরি হয়ে আসছে। সে-আদর্শ মূল্যহীন হয়নি। হতেও পারে না। একে অস্বীকার করার চেষ্টা দৃষ্টিক্ষীণতার জন্যেই সম্ভব। এদের ঘিরে সমালোচনা যা তৈরী হয়েছে তাকেই বা তুচ্ছ করি কি করে। অজিত চক্রবর্তী প্রমথ চৌধুরীর মতামত ও পদ্ধতি মূল্য হারিয়েছে, একথা বলা দুঃসাহসিক তো বটেই অসত্যও। তবু সাহিত্য নতুন পথ খুঁজছে। কবিতা খুঁজছে নতুন রীতি, উপন্যাস খুঁজছে নতুন বিষয়, গল্প খুঁজছে নতুন টেকনিক এবং বক্তব্য। তারি সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনাও সন্ধান করছে নতুন সাহিত্যের বিচারের চাবিটি।

মোহিতলাল-নজরুলের পর প্রেমেন্দ্রে মিত্রর মতো কবিকে বোঝবার বাধা নেই। এমন কি সেকালের দিনে শনিবারের চিঠিতে জীবনানন্দের কবিতা সম্পর্কে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ হলেও রবীন্দ্রযুগের রোমান্টিক চেতনায় অভ্যস্ত পাঠকের পক্ষে তাঁর কবিতার রস উপভোগ করায় শেষ পর্যন্ত বাধা হয় না। বিষ্ণু দের

অসংলগ্ন কবিতা পঙ্‌ক্তিতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে অর্থ না হোক অর্থের আভাস পাওয়া কঠিন হয় না। এলিয়টের কবিতা যদি আমাদের কাব্যরসবোধে বাধা না ঘটায় বিষ্ণুবাবুর কবিতাও বাধা ঘটাবে না। তবু এই কাব্যপ্রকরণই তো আমাদের ভাবিয়ে তুলবার পক্ষে যথেষ্ট।

নতুন সমালোচনার কর্তব্য স্বভাবতই আগের থেকে অনেক বদলে গেল। কবিদের মধ্যে যে নতুন দৃষ্টি এসেছে, আগের নিশ্চিন্ত নিরুদ্‌বেগ আত্মমগ্নতা যে নেই, এটা এখন সকলেরই জানাজানি হয়ে গিয়েছে। বাঙালি পাঠকেরা এটাও মেনে নিয়েছে যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে আর সে-রকম ভেদ নেই। অভিজ্ঞতা সকলেরই একই রকম। বর্তমান সমাজের ও সভ্যতার এই অবস্থায় মনগুলি যেন এক-একটি টাইপে পরিণত হয়েছে। বক্তব্যে অভিনবত্ব আনাই কঠিন। কিন্তু সে-যুগের সমালোচনার একটা কথা বোধ হয় অস্বীকার করা যায় না—লেখক যদি সার্থক হন, তবে তাঁর লেখার একটা নিজস্ব প্রকাশবৈশিষ্ট্য থাকবেই। কোন্ কবি কেমন করে বলেন, আজকের সমালোচনায় সেটাই যেন বড়ো কথা। এবং এর থেকেই কাব্যপ্রকরণ-আলোচনার নতুন রীতি দেখা দিয়েছে। কিন্তু স্পষ্ট করে বলাই ভালো এই কাব্যবিশ্লেষণ রীতির সঙ্গে প্রাচীন রীতির আকাশ পাতাল পার্থক্য। শুধু যে পরিভাষা এবং অলংকার-বিচারই পরিবর্তিত তা নয়, এখনকার সমালোচনায় বিচার্য শব্দের শ্রেণীভাগ নয়, শব্দের ও বাক্যের অনন্যপর স্বয়ংসম্পূর্ণতা। প্রতি শব্দকেই তার নিজস্ব প্রয়োগে একটিই অর্থ নির্দেশ করতে হবে। সেই শব্দই হয় তো অন্য স্থানে আবার অন্যতর অর্থ নিয়ে আসবে। কবিতা-বিশেষে কবির মনের ভাব প্রকাশে শব্দকে একটি অমোঘ দায়িত্বই দেওয়া হয়। What should such fellows as I do crawling between earth and heaven-এতে crawling-শব্দটি নিঃসন্দেহে সরীসৃপের ভাবটিই নিয়ে আসে। এখানে আর কোনো ছবি খাটে না। রিচার্ডস্ ও এমসন ইংরেজি সাহিত্যে যে-নতুন সমালোচনার সূত্রপাত করেছেন, নতুন কবিতা বোঝানোর জন্যেই তার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যখন বলেছিলেন মালার্মে-প্রদর্শিত শব্দসঙ্গীতই তাঁর অন্বিষ্ট, তখন তাকে বুঝতে হবে নতুন কাব্যরীতির দিক দিয়েই। সুধীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যটি বাংলায় নতুন সমালোচনার একটি সূত্র বললেই হয়। নতুন কবিতা নিয়ে পুরানো রীতিতে বিচার অবশ্যই অর্থহীন নয় ; যুগ-জীবন-পটভূমি আলোচনা কাব্য বোঝার অনেকখানি সহায়ক, তবু কাব্য বোঝবার উপায় হচ্ছে শব্দপ্রয়োগের অমোঘতা সন্ধান। কিন্তু যতদূর মনে হয় সুধীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যটি আমরা তাঁর নিজের কবিতা সম্বন্ধে যতখানি প্রযোজ্য মনে করেছি, অন্যের ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন মনে করিনি। আধুনিক কবিতার আলোচনায় পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি এবং কয়েকটি নতুন ধরনের শব্দ ব্যবহারের দৃষ্টান্তই তুলে দেখানোতে কর্তব্য সমাপ্ত। তা ছাড়া কবিতা ব্যতীত অন্য শ্রেণীর সাহিত্য, গল্প-উপন্যাসে, নতুন সমালোচনার কোনো প্রয়োগ নেই। যতদূর জানি, গল্প-উপন্যাসের প্রসঙ্গে নতুন সমালোচনার দাবীও কেউ

উত্থাপন করেনি।

গল্প ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে যে অভিনবত্বের প্রবর্তন হয়েছে, সে তো চোখ এড়াবার কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-পড়া পাঠকের কাছে তারাশঙ্কর শরদিন্দুর লেখা বুঝতে কোনোই অসুবিধা নেই। কিন্তু বিরল-প্লট মনস্তত্ত্ব-সর্বস্ব গল্পরীতিতে যে সংস্কারহীন অকুণ্ঠতা আছে, তার সমঝদার পাঠক নিশ্চয়ই আছে, নইলে বহুবিক্রীত সাপ্তাহিক পত্রে এই গল্প এত প্রশ্রয় পেত না। এসব গল্পে লেখক মূলত একটা কিছু বলেন ঠিকই, সেই বক্তব্যটি বস্তুত কোনো ছড়ানো বা ব্যাপক কোনো বক্তব্য নয়। আগে উপন্যাসে বা নাটকে প্রথম থেকে শেষাবধি সবটাই হত একটা ক্রমবিকাশশীল উপস্থাপনা। সুতরাং প্লটের কৌশল, চরিত্রের অভিব্যক্তি—এই মানদণ্ডে তাদের আলোচনা চলেছে। এখন তো গল্পে এদিকে লেখকের দৃষ্টি নেই। দৃষ্টি পড়েছে, মনের কোন জটিল অন্ধ কোণে। সেটাকে দেখানো নয়, কিংবা বোঝানো নয়, সেটাকে অনুভব করিয়ে দেওয়া কিংবা সেই অন্ধ জগতে আমাদের দাঁড় করিয়ে দেওয়া। সমরেশ বসুর 'বিবর' কী আলোড়ন তুলেছিল, সেটা ভুলিনি। আলোচনাটা ছিল লেখকের বক্তব্য অনুমান করে। সে-বক্তব্যে আপত্তি থাকতে পারে কিন্তু সমালোচনার কাজ কি বক্তব্য বিচার করা, না প্রকরণ বিচার করা? রীতির দিক দিয়ে এ-গল্পটি নিঃসন্দেহে নতুন। সমরেশ বসু উপন্যাসের আয়তনে যে রীতি প্রয়োগ করেছেন, ছোটো গল্পে তার প্রয়োগ আজকাল প্রায়শই চোখে পড়ে। রচনারও 'এফেক্ট্' নির্ভর করে শব্দের ওপর। এই এফেক্ট্ সৃষ্টি করাই তো নতুন গল্পের কাজ ও সাফল্য।

অতএব কবিতাই বলি আর গল্প-উপন্যাসই বলি, নতুন সমালোচনার আদর্শ হবে এই শব্দপ্রকরণ ব্যাখ্যা। সে-চেষ্টা হচ্ছে না, এমন কথা বলা যায় না। চিত্রকল্প-আলোচনা নতুন নয়। রোমান্টিক কবিতায় চিত্রকল্প বিচার ও ব্যঞ্জনাসন্ধান পরিচিত পন্থা এবং সার্থক কাব্যালোচনার উপায়। সে-পদ্ধতি আমাদের সাহিত্যে যে যথেষ্ট হয়েছে তা নয়, তথাপি এই সমালোচনা প্রচলিত। ইংরেজিতে চিত্রকল্প বিশ্লেষণ দ্বারা ব্যক্তিকে নির্ণয় করার প্রয়াস হয়েছে। সে-প্রয়াসও শেষ পর্যন্ত প্রায় সংখ্যাতত্ত্বের উদাহরণে পর্যবসিত হয়েছিল। সম্ভবত সে রীতি এখন আর জনপ্রিয় নয়। কিন্তু চিত্রকল্প দিয়ে কবিতার সৌন্দর্য-বিশ্লেষণের রোমান্টিক পদ্ধতির মূল্য আজও সমান অক্ষুণ্ণ। বুদ্ধদেব বসুর 'কবি রবীন্দ্রনাথ' বইটিতে এর চমৎকার প্রমাণ পাওয়া যায়। বুদ্ধদেববাবুর আলোচনায় এমসনের ছায়া যা পাওয়া যায়, সেটা এই সমালোচনার পক্ষেই স্বাভাবিক। শব্দকেই কোনো ভাবের প্রতীক রূপে ব্যবহার করে চিত্রকল্প রচনা রোমান্টিক কাব্যতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য, আবার সেই শব্দকেই একটা বিশেষ প্রসঙ্গে বিশেষ অর্থের প্রতীক করে তোলায় আধুনিকতর কাব্যপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য।

বস্তুত নতুন সমালোচনা যেন প্রতীক ব্যাখ্যানেই ব্যাপৃত। সাহিত্য এখন যে পুরোপুরি প্রতীকধর্মী হয়ে উঠেছে, সে তো কারো অগোচর থাকবার কথা নয়।

প্রাচীন সমালোচকের অনুকরণবাদ, পরবর্তী সমালোচকের সাহিত্য-জীবনবাদ পেছনে ফেলে এসেছি। জীবনের ব্যাখ্যা হিসাবে সাহিত্যকে বোঝা এখন যেন প্রথাবহির্ভূত হয়ে পড়েছে। ধ্বনি ও শব্দ-প্রতীক বিশ্লেষণ করে সাহিত্যের চমৎকারিত্ব আবিষ্কার করার দিকে লেখকদের মনোযোগ নিবদ্ধ।

বাঙালি পাঠক সাধারণ ভাবেই এই সমালোচনা পদ্ধতিতে এখনও অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি। বোধহয় সেই জন্যই কবিতা এবং গল্পের দুর্বোধ্যতার অভিযোগ এখনও সরব। কিছুকাল থেকে লক্ষ্য করছি, আধুনিক সাহিত্যের পাঠককে এই সমালোচনায় দীক্ষিত করবার উদ্যম হচ্ছে। এক সময়ে বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকা যেমন নতুন কবিতা প্রচলনে সফল হয়েছিল, 'কবিতা-পরিচয়' নামক কবিতা সমালোচনার পত্রিকাটিও হয় তো তেমনি সফল হবে। এই পত্রিকার কবিতা আলোচনা পদ্ধতিতে স্পষ্টতই নতুন সমালোচনার আদর্শকে মেনে নেওয়া হয়েছে।

বাংলায় নব্য সমালোচনা

আমরা অনেক সময় আক্ষেপ করেছি এই বলে যে রবীন্দ্রনাথের শেষবয়সে বাংলা কবিতার যে-রূপান্তর হয়েছে, তাই নিয়ে এক সময়ে অনেক বাদ বিতর্ক সংশয় ব্যঙ্গ এবং সমাদর হলেও এই কবিতার মূল্য বিচারের কোনো পদ্ধতি গড়ে ওঠেনি। প্রথম যুগে যখন এ-সব কবিতা লেখা হতে লাগল তখন কবিরা কোনো প্রচলিত সমালোচনাপদ্ধতির সমর্থনের প্রত্যাশা নিয়ে লেখেননি। আমাদের দেশে যেমন ছিল রসবাদ য়ুরোপেও ভিকটোরিয় যুগ পর্যন্ত তেমনি ছিল জীবনবাদ। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রচলিত রসবাদ অবশ্য উনিশ শতকে বঙ্কিমের সময় থেকেই বাংলা সাহিত্যে অপ্রযোজ্য হয়ে পড়েছিল। তথাপি বাংলা সাহিত্যশিক্ষার্থীদের এই তত্ত্বটি সম্বন্ধে একটা ধারণা রাখতেই হত এবং তার ফলে সংস্কৃত অলংকারের কিছু কিছু পরিভাষা এবং চিন্তাও আধুনিক বাংলা সমালোচনাতে স্থায়ী হয়ে গিয়েছিল। যেমন 'রস' শব্দটি বাংলা সমালোচনাতে অপরিহার্য হয়েছে যদিও প্রাচীন তাত্ত্বিকেরা ঠিক যে-অর্থে রস কথাটি ব্যবহার করতেন আমরা সে-অর্থে তার ব্যবহার করিনি। সংস্কৃত আলংকারিক এবং রসতাত্ত্বিক পদ্ধতি বাংলা সাহিত্য বিচারণায় ব্যবহৃত না হলেও ওই পদ্ধতিকে আমরা কখনই ভ্রান্ত বলে মনে করিনি। তার প্রধানতম প্রমাণ অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'কাব্যজিজ্ঞাসা' নামের সুবিখ্যাত বইটি। এ বইটি তিনি লিখেছিলেন ১৯২৮ সালে, তখন রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক সাহিত্যের সময়। অতুল গুপ্ত লিখেছিলেন, রসতত্ত্ব দিয়ে আধুনিক কবিতার সমালোচনা সম্ভব বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।

অবশ্য কার্যত সেই চেষ্টা কেউ করেছেন বলে জানি না। এমন কি রসতাত্ত্বিক প্রণালীতে অতুল গুপ্ত রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো কবিতার বিচার করে দেখালেও রবীন্দ্রকাব্য সেভাবে কেউ সমালোচনা করেনি। আধুনিক কবিতা তো নয়ই। উনিশ শতক থেকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সমালোচনা পাশ্চাত্য পদ্ধতিতেই হয়ে এসেছে। পাশ্চাত্য পদ্ধতি বলতে অ্যারিস্টটল থেকে ক্রোচে পর্যন্ত সমালোচনার নানা রূপান্তরকেই বোঝায়। অমলেন্দু বসুর মতে :

'ইউরোপের অন্য বহু দার্শনিক মতবাদের মতোই নন্দনতত্ত্বেও দুটি মাত্র মূল ধারা আছে—প্লেটোর ধারা ও আরিস্টটল-এর ধারা। ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব প্লেটোর কাব্যতত্ত্বের সমগোত্রীয় এবং ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে আজ পর্যন্ত দু'টি ধারাই সমভাবে চলমান, প্লেটোর অতিলৌকিক মতবাদ ও আরিস্টটল-এর যুক্তিবাদ।'

এই কথাটাকেই আরও বিশদ করে তিনি বলেছেন :

'সংস্কৃত অলঙ্কার সূক্ষ্ম শ্রেণীকারী বিশ্লেষণের এবং পূর্বকালীন মনোবিদ্যার আশ্চর্য উদাহরণ বটে। তবুও, চরম বিচারে, সংস্কৃত অলঙ্কার ও গ্রীকো রোমান অলঙ্কার অভিন্নমূল্য, কেননা উভয়ের দৃষ্টিই বাক্যের প্রভাবে নিবদ্ধ, অলঙ্কৃত

বাক্যকে মেনে নিয়ে শ্রোতার চিত্তে প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণে নিযুক্ত অর্থাৎ এই দুই অলঙ্কার শাস্ত্রই শ্রোতার দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্যকে দেখেছে। এ দৃষ্টিকোণ অতি সঙ্গত ও মূল্যবান দৃষ্টিকোণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু আধুনিক সমালোচক এ দৃষ্টিকোণে সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি। তিনি চেয়েছেন শ্রোতাকে ছাড়িয়ে, বাক্যোত্তীর্ণ হয়ে বাক্যের অন্তর স্থলে যে সৃজনীশক্তি বর্তমান তার সন্ধান করতে। স্থূল কথা বলা যায় যে গ্রীকো-রোমান ও সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা আরিস্টটল-পন্থী, বস্তুবাদী, অপর পক্ষে আধুনিক আলঙ্কারিক প্লেটোপন্থী, ভাববাদী।'

তাহলে দেখা যাচ্ছে রোমান্টিক কাব্য এবং কাব্যতত্ত্ব প্লেটোর ভাববাদী দৃষ্টিকেই অনুসরণ করেছে। আমাদের দেশেও যাঁরা বলেন 'কাব্যম্ গ্রাহ্যম্ অলঙ্কারাৎ', তাঁরা ছাড়া যাঁরা ধ্বনি এবং রসকেই সার্থক কাব্যত্বের লক্ষণ বলে মনে করেন তাঁরা বস্তু-অতিক্রান্ত ব্যঞ্জনাময় শব্দজগতের কল্পনাতেও ভাববাদী। তাই এঁরা শাশ্বত রসের সৃষ্টিতে বিশ্বাসী। রবীন্দ্রনাথও এই তত্ত্বে অচলপ্রতিষ্ঠ ছিলেন। তাঁর সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে সাহিত্যের এই সনাতন আদর্শের কথাই বার বার বলেছেন। ক্রোচে ভাববাদী দার্শনিক। তিনি যেমন বলেছেন Intuition is vision, রবীন্দ্রনাথও তেমনি বলেছেন 'দৃষ্টি মোর সে তো সৃষ্টিকরা'। রবীন্দ্রযুগের প্রণিধেয় সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের সাহিত্যতত্ত্বের নাম 'দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ'। সে নাম মোহিতলালই দিয়েছিলেন।

এই বিষয়টির উল্লেখ এবং আলোচনার প্রয়োজনীয়তা এই যে আমাদের সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত কাব্যাদর্শের একটা তত্ত্বগত ভিত্তি ছিল, এটাই স্পষ্ট করে বলা। এই সাহিত্য সমালোচনা একটা সর্বজনগ্রাহ্য মাপকাঠি দিয়েই করা চলত। সমালোচনায় আমরা সনাতনতত্ত্বের কথা বার বার স্মরণ করে কাব্যমূল্য নির্ণয় করতে চেয়েছি। আবার সেই সঙ্গে আলঙ্কারিক পদ্ধতিতে আমরা শব্দ ছন্দ বাক্যের সুমিতি ও সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করে সার্থক কাব্যকে চিনে নিতে চেয়েছি। বিচারের এই মাপকাঠি নিয়ে নানা আলোচনা হয়েছে সত্য, বিচারের মূল পদ্ধতি নিয়ে প্রতিবাদ দেখা গিয়েছে বলে জানি না। উপন্যাস নাটক প্রসঙ্গে যেমন আরিস্টটলের যুক্তিবাদকে আমরা অবলম্বন করেছি, কাব্য কবিতা প্রসঙ্গে তেমনি প্লেটো বা ভরতের রসের সার্বজনীনতার তত্ত্বকে ধরে রেখেছি। আবার আরিস্টটল যেমন তাঁর গুরুর ভাববাদকে সম্পূর্ণ অস্বীকার না করেও নিজের যুক্তিবাদী বস্তুনিষ্ঠাকে তার সঙ্গে সমন্বিত করে poetic universality-র কথা বলেছিলেন আমাদের প্রাচীন সাহিত্য বিচারেও লৌকিক থেকে অলৌকিক নির্বিশেষত্বের লক্ষ্যকেই বলা হয়েছিল সাহিত্যের লক্ষ্য। এভাবেই ইংলান্ডে ভিক্টোরিয় যুগ এবং আমাদের বাংলায় রবীন্দ্রযুগ পর্যন্ত সাহিত্যের সনাতন মানদণ্ড তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

এই মানদণ্ড নিয়ে প্রশ্ন উঠল তার পরের যুগে যখন ইংলন্ডে এবং আমাদের

দেশে 'আধুনিক' কবিতা লেখা শুরু হল। একদিকে লেখকরা বাস্তবানুগত্যের ফলে রসের সনাতনত্বকে অস্বীকার করতে চাইলেন, অন্যদিকে কবিরা কবিতার বিচিত্র শৈলী অনুসরণ করে কাব্যরচনার সনাতন পদ্ধতিকে অস্বীকার করতে চাইলেন। কোনো নীতিনিয়মে বদ্ধ হওয়ার ক্লাসিকাল প্রবণতাকে বলা হল সততার অসম্মান। রসসৃষ্টির নিত্যতার নামে প্রত্যক্ষ বর্তমানের অভিজ্ঞতাকে অবহেলা করাই মিথ্যাচরণ। আধুনিক কবি আত্মনিষ্ঠ সৎ বলেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে বাদ দিয়ে অলীক কল্পনা দিয়ে বাস্তববর্জিত রসের সাধনায় মগ্ন নন।

কবিতার আধুনিক রূপ পরিগ্রহণের কারণ কি তার অনেক আলোচনা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বর্তমান সমাজ সভ্যতার বিচ্ছিন্নতার কথা, অর্থনৈতিক পটপরিবর্তনের কথা, বৈজ্ঞানিকতার প্রসারের কথা—রবীন্দ্রনাথ-কথিত বিষয়ের আত্মতার কথা প্রভৃতি নানা কারণ দেখানো হয়ে থাকে, তার কোনোটাই মিথ্যা নয়। কিন্তু এ-সবই রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিতার আবির্ভাবের ঐতিহাসিক কারণ নির্ণয়; কবিতার তত্ত্ব নয়। ইতিহাস আর কাব্যতত্ত্ব যে এক নয়, এটা অনেক সময় আমরা মনে রাখি না। অনেক সময়েই আমরা তত্ত্ব নির্ণয় করতে গিয়ে ইতিহাসের পর্যালোচনায় নিযুক্ত হই। অবশ্য এ-কথাও কখনও কখনও স্বীকার্য যে তত্ত্বের আলোচনায় ইতিহাস সহায়ক হয়। দুহাজার বছরে যেমন কাব্যতত্ত্বের একটা স্বতন্ত্র শাস্ত্র গড়ে উঠেছিল, তার ইতিহাস থাকতেই পারে কিন্তু কাব্যরচনার ইতিহাস আর কাব্যরচনার তত্ত্ব যে এক নয়, এটা বোঝা কিছু কঠিন নয়। আধুনিক কবিতা রচনার ইতিহাস আছে কিন্তু আধুনিক কবিতার নিজস্ব কোনো তত্ত্ব ও শাস্ত্র আছে কি? জীবনানন্দ দাশের প্রথম কবিতা লেখার সময় থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা কবিতার যে ধারা গড়ে উঠেছে, তার ইতিহাস রচনা সম্ভব কিন্তু এই কাব্যসাহিত্যের নিজস্ব তত্ত্ব বা শাস্ত্র গড়ে ওঠেনি, তা অস্বীকার করা যায় না। বিচ্ছিন্ন ভাবে বুদ্ধদেব বসু বা অন্য কেউ লিখেছেন কিন্তু আধুনিক কবিতা চিরাচরিত সাহিত্য-মানদণ্ডকে অস্বীকার করলেও নিজস্ব একটি মানদণ্ড অর্থাৎ সাহিত্যশাস্ত্র তৈরি করে তোলেনি।

অধ্যাপক অমলেন্দু বসু বই লিখেছেন কমই, কিন্তু একমাত্র তিনি সেই বিশুদ্ধ সমালোচক যিনি এই অভাব পূরণ করার চেষ্টা করেছিলেন। আধুনিক কাব্য কোথায় এবং কী ভাবে সার্থকতা লাভ করতে পারে তার নির্দিষ্ট নিয়ম নির্ণয় করে আধুনিক কবিতার জন্য বাংলায় একটি কাব্যশাস্ত্র তিনিই দিয়ে গিয়েছেন।

'সাহিত্যচিন্তা' বইতে সমালোচনা-পদ্ধতি নামে পাঁচ প্রস্তাবে বিভক্ত একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ আছে। প্রস্তাবগুলির নাম, ভাষাভিত্তিক বিচার, শৈলীবিচার, বাক্-প্রতিমার আলোচনা, প্রতীকবিচারী আলোচনা এবং মনস্তাত্ত্বিক আলোচনা। প্রবন্ধগুলি বেরিয়েছিল 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় ১৩৬০ থেকে ১৩৬৪-র মধ্যে অর্থাৎ ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৭-র মধ্যে। এই প্রবন্ধগুলিতে অমলেন্দু বসু কবিতা সমালোচনার আধুনিকতম পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছিলেন। এই পদ্ধতির সঙ্গে

প্রথাগত সমালোচনা প্রণালীর মিল ছিল না। এতকাল আমরা কবিতার আলোচনায় কবিতার বিষয়ের উপরেই জোর দিয়ে এসেছি। কবিতাটি সমগ্রভাবে পড়ে নিয়ে তার বিষয়টিকে স্থির করে নিয়েছি, তারপর ওই বিষয় থেকে কবির বক্তব্য নিষ্কাশন করে ভাষায় তার অভিব্যক্তিটাকেই লক্ষ্য করেছি। ফলে কোনো কবিতার আলোচনার অর্থ দাঁড়ায় কবি বা কবিমানসেরই আলোচনা। রবীন্দ্রনাথের কোনো কবিতা পড়তে গেলে কবিমানসটি বুঝে নিয়ে তার কালগত বা স্থানগত প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা করে নিয়ে তবে কবিতাকে বোঝা সম্ভব হয়। রোমান্টিক ক্রিটিসিজ্‌মের বৈশিষ্ট্যই এই—কবিতাকে সমগ্রভাবে মনে গ্রহণ করে নেওয়া এবং নিষ্কাশিত বক্তব্যের কল্পনা ও ভাবগত বিন্যাসকে মূল বক্তব্য ও বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিশ্লেষণ করে বলা। সুতরাং এতে পাঠকের অনুভূতি-গ্রাহ্যতারই যেন পরীক্ষা হয়ে যায়। যে পাঠক যত সুন্দর করে একটি কবিতার প্রসঙ্গে নিজের অনুভূতিকে উপস্থাপিত করে বলতে পারবেন তিনিই তত সার্থক সমালোচক। রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যটিকে সমালোচনার মূল সূত্র রূপে অনেকে গ্রহণ করে থাকেন—'সমালোচনা হচ্ছে একটি ফুলের পাশে আর একটি ফুল ফোটানো।'

একে বলা যায় ইনপ্রেশনিস্টিক বা সবজেকটিভ সমালোচনা। নানা কারণে আধুনিক কবিতার ইসপ্রেশনিস্টিক সমালোচনা করা কঠিন। কারণ আধুনিক কবিতার রূপ ও রীতি এতই আলাদা যে কবিতাপাঠে তার থেকে সামগ্রিক বক্তব্য বা ধারণা স্থির করে নেওয়া সহজ নয়। কবির অভিপ্রায় নানার্থক হয়ে ওঠে ; আমরা যে চিরন্তন রসের কথা বলে এসেছি তাও খুঁজে পাওয়া যায় না। এই জন্যই কবিতা সমালোচনার নতুনতর পদ্ধতির প্রয়োজন হয়েছিল। অমলেন্দু বসু সে রকম একটি পদ্ধতির সন্ধান দিয়েছিলেন তাঁর 'সমালোচনা পদ্ধতি' নামের প্রবন্ধগুলিতে। অবশ্য এর অর্থ নয় যে এই পদ্ধতি অমলেন্দু বসুই উদ্ভাবন করেছিলেন। 'নিউ ক্রিটিসিজম' নামে যে সমালোচনার আদর্শ সে দেশে প্রচলিত হয়েছে, আমাদের দেশে অমলেন্দু বসুই তাকে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলছেন :

'আধুনিক ইওরোপীয় সমালোচনায় প্রবর্তিত হয়েছে নূতন ধরনের রেটরিক-বিচার। ইংরেজ সমালোচক রিচার্ডস এই নব্য পন্থায় অগ্রগণ্য, অন্যান্য দেশের অনেক সমালোচক—বিশেষত আমেরিকায় যাঁরা নিউ ক্রিটিকস এ-আখ্যা পেয়েছেন—সাহিত্যের অলঙ্কার সম্পর্কে পুনরায় উদ্যমশীল যদিও এঁদের সকলেই রিচার্ডসের মত অনুসরণ করছেন না। এই নব্য অলঙ্কার শাস্ত্র এ যুগের একটি বিখ্যাত দার্শনিক চিন্তাধারা থেকে প্রেরণা পেয়েছে। কেম্ব্রিজের অধ্যাপক 'মুর প্রবর্তিত "লজিক্যাল পজিটিভিজ্‌ম" এ-সমালোচনার মূল উৎস। এই দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে মিলেছে আরো কয়েকটি আধুনিক জ্ঞান, নৃতত্ত্বের ও মনস্তত্ত্বের কতকগুলি ধারণা আর সেই সঙ্গে এই ঐতিহাসিক বোধ যে ভাষাতীত প্রত্যয়কে ভাষায় রূপান্তরিত করার চেষ্টায় মানুষ বহু প্রাচীন কাল থেকেই প্রতীকী বচনের

আশ্রয় নিয়েছে।'

অমলেন্দু বসু 'রেটরিক' শব্দটি ব্যবহার করছেন বলে মনে হতে পারে প্রাচীন আলঙ্কারিক রীতিই বুঝি ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। আসলে শব্দ ও প্রতীক ব্যবহারের ভাব ও অর্থ জ্ঞাপনের নৈপুণ্য দিয়ে কাব্যত্ব নির্ণয় করাই এই রীতির বৈশিষ্ট্য। সেকালের অলঙ্কার বিচার ছিল নেহাৎই বহিরঙ্গ বিচার। তার দ্বারা সব সময়ে কবির অভীপ্সিত চিত্ররূপ অথবা ভাবরূপ ব্যাখ্যা করে বোঝানো যেত না। নতুন সমালোচনাতে শব্দ শৈলী এবং প্রতীক বিচারের দ্বারা কবিতার সৌন্দর্যকে অনুভব করা সম্ভব। আধুনিক কবিতা পড়তে গিয়ে যে দুর্বোধ্যতা বা বাক্য ও ভাবগত অদ্ভুতত্বের সম্মুখীন হই এই সমালোচনায় সেটা আর বাধা হয়ে দাঁড়ায় না।

এই নতুন সমালোচনার সহজতম (আসলে সহজতম নয়, শ্রমসাধ্য) প্রণালী ভাষাবিচার। ভাষার বিশিষ্ট অর্থসন্ধান করে কবিতায় তার প্রয়োগ লক্ষ্য করে কবির সৃজনীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের দেশে যাকে ব্যাঙ্গ্যার্থ বলা হত, এটা ঠিক তা নয়। অভিধার্থেই শব্দের বিশিষ্ট প্রয়োগের দ্বারা কবিব্যক্তিত্বটি প্রকাশ পায়। অমলেন্দু বসু বলছেন 'প্রত্যেক সার্থক কবির ভাষাপ্রয়োগে স্বকীয়তার ছাপ সুস্পষ্ট' প্রত্যেক কবি—তথা, সাহিত্যস্রষ্টা—তাঁর বিশিষ্ট শব্দপ্রয়োগে ভাষাকে অগ্রগত করে দেন, একথা যেমন সত্য' তেমনি সত্য যে প্রত্যেক সাহিত্যিকের স্বকীয়তা সমসাময়িক ভাষার গুণাবলীর ভিত্তিতেই নির্মিত। রবীন্দ্রনাথের ভাষা এবং বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার স্বাতন্ত্র্য আছে, তেমনি প্রত্যেক যুগেরই থাকে নিজস্ব ভাষার সাহিত্য-প্রকৃতি। 'প্রত্যেক যুগের সাহিত্যিক প্রকৃতিতে আর ভাষারূপে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। যেন একই কম্পাসের দুটি কাঁটা।' অবশ্য এভাবে ভাষাবিচার করে সাহিত্যস্বাদ পাওয়ার চেষ্টার পিছনে ইতিহাস ও সমাজ-বোধের প্রয়োজন। সে জন্য শ্রম ও অধ্যয়নও দরকার। ভাষার বিবর্তনের সঙ্গে সমাজের বিবর্তনের সম্বন্ধ নিবিড়। যাঁরা সাহিত্যের সৌখীন পাঠক তাঁদের কাছে এই শ্রমসাধ্য সাহিত্যপাঠ তেমন আদরণীয় না হতেও পারে। কিন্তু যে-কোনো সাহিত্যসৃষ্টির অন্তর্নিহিত মহত্ত্ব বুঝতে গেলে এর প্রয়োজন থাকবেই।

তার সঙ্গে এটাও বোঝা দরকার যে 'শব্দমাত্রই নির্গুণ, শব্দের গুণ জন্মায় অপর শব্দের কনটেক্স্টএর পরিবেশে'। এ ভাবে শব্দের সঙ্গে শব্দের সহযোগিতার দ্বারাই গড়ে ওঠে বিশিষ্ট শৈলী। এই প্রসঙ্গেই অমলেন্দু বসু আমাদের অবহিত করেছেন একটি পরিচিত বক্তব্যের নতুন ব্যঞ্জনায়। সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রে রীতি শব্দটির ব্যবহার ছিল কিন্তু স্টাইল বলতে আমরা যা বুঝি রীতি দিয়ে তাকে ঠিক বোঝানো যায় না। রীতি বলতে সাধারণভাবে বোঝায় রচনাগত শ্রেণী, আর সাহিত্যে স্টাইল বলতে বোঝায় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বমণ্ডিত রচনা। এ জন্যই বলা হয় অমলেন্দু বসুও স্টাইল শব্দটির এই প্রথাগত ধারণায় বিশ্বাসী এবং সেজন্য মনে হয় ভিকটোরিয়ান সাহিত্যতত্ত্বকে তিনি মোটেই অগ্রাহ্য করেননি। কিন্তু তিনি আরো অগ্রসর হয়ে স্টাইল তত্ত্বের সঙ্গে আধুনিক স্টাইলিসটিকস

নামক নবোদ্ভূত সাহিত্যতত্ত্বের যোগ ঘটিয়েছেন। স্টাইলতত্ত্বে শব্দের ভাবরূপের উপর জোর পড়ত, স্টাইলিস্টিকসে আলাদা-আলাদা শব্দ, শব্দসমাবেশ, শব্দের অর্থ ও ধ্বনি, যোজিত শব্দের দৃশ্য ও শ্রুত রূপ শব্দের ইমেজ বা বাক্-প্রতিমা, তার প্রতীকী অর্থ, বহুস্তরে বিন্যস্ত অথবা সুস্পষ্ট ঋজু অর্থ, তার সেনসুয়াস বা ইন্দ্রিয়বেদী দ্যোতনা ভাবনাধর্মিতা বা অনুভূতিধর্মিতা, সংক্ষেপে ভাষার অবয়বী ও আন্তর সম্পর্ক, এসবই আলোচ্য এবং বিশ্লেষিতব্য বিষয়। এরই নাম শৈলীবিচার। শৈলীবিচার কবিতাসমালোচনার একটি বিশিষ্ট প্রণালী।

শৈলীর ব্যষ্টিরূপ হচ্ছে শব্দ। শব্দের সঙ্গে কবির দৃশ্যানুভূতি, শ্রবণানুভূতি গন্ধানুভূতি ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ানুভূতি যুক্ত হয়ে যখন সেই শব্দ অথবা শব্দগুচ্ছ কবিকল্পনাকে স্পষ্ট করে দেয়, তখন সেই শব্দ বা শব্দগুচ্ছকে বলা যায় বাক্-প্রতিমা। বাক্-প্রতিমা শব্দটি অমলেন্দু বসুই তৈরি করেছিলেন এবং এই শব্দটিই চিত্রকল্পের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছে। বাক্প্রতিমা চিত্রকল্পের চেয়েও পূর্ণতর অর্থের দ্যোতক। বাক্প্রতিমা বিচার করে কবিতার সৌন্দর্য বিশ্লেষণ নতুন সাহিত্য সমালোচনার আর-একটি পদ্ধতি। অমলেন্দু বসু দেখিয়েছেন, বাক্প্রতিমা কত রকমের হতে পারে, কখনও সে নিছক ইন্দ্রিয়ানুভূতির উদ্রেককারী, কখনও ইন্দ্রিয়ানুভূতি উদ্রেক করেও মননাভিমুখী, কখনও বাক্প্রতিমা অশরীরী চিন্তায় কোনো অ্যাবস্ট্রাকট উপলব্ধির উদ্রেক করে। এদের প্রত্যেকের মধ্যেই নানা জটিলতা থাকতে পারে। তার বহু দৃষ্টান্ত দিয়েছেন অমলেন্দু বসু রবীন্দ্রনাথের বাক্প্রতিমার আলোচনা প্রসঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বাকপ্রতিমা বিচার দ্বারা কবিতা সমালোচনার দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রধানত গ্রহণ করে নিলেও বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, অজিত দত্তের কবিতা থেকে বহু কবিতাংশ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে তিনি এই রীতির কাব্যসমালোচনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বস্তুত বাক্প্রতিমা বিচার করে রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্র-পরবর্তী প্রতিষ্ঠিত কবিদের কাব্যোৎকর্ষ দেখানোর এমন ব্যাপক প্রয়াস বোধহয় অমলেন্দু বসু ছাড়া আর কেউ করেননি। এমন কি বুদ্ধদেব বসু স্বয়ং উৎকৃষ্ট সমালোচনার নিদর্শন রেখে গেলেও এই পদ্ধতিতে সমালোচনা তিনি করেননি।

প্রতীকবিচারী সমালোচনা নিয়ে অমলেন্দু বসুর আলোচনাই সবচেয়ে দীর্ঘ। এতে তিনি প্রতীকতত্ত্বের ইতিহাস এবং বৈশিষ্ট্য সাহিত্যে তার প্রয়োগ নিয়ে যথেষ্ট গভীর এবং সর্বাঙ্গীন আলোচনা করেছেন। প্রতীকের আদিম ব্যবহার থেকে ধর্মে সমাজে আচারে ব্যবহারে এর অর্থগত পরিবর্তনের অসাধারণ স্পষ্ট এবং পরিচ্ছন্ন ধারা নির্দেশ করেছেন এইভাবে।

'গোড়ায় প্রতীক ছিল নিদর্শন মাত্র, এখন প্রতীক হয়ে উঠল অব্যয় ধারণার ইঙ্গিতসম্পন্ন। অভিজ্ঞানের অন্তর্লীন তাৎপর্য সম্বন্ধে মানুষ কবে থেকে সচেতন হল সঠিক বলা সম্ভব নয়—হয়তো ইতিহাসের শুরু থেকেই-কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে খৃষ্টধর্মের প্রচণ্ড প্রয়োজনে ইওরোপীয় মানব নিদর্শনের শাদামাটা

অর্থ পেরিয়ে পৌঁছলো প্রতীকের গভীর স্তরে। প্রতীকবস্তু এখন অপর যে বস্তুর অভিজ্ঞান, যার ধারণাজ্ঞাপক, সে বস্তু কেবল বস্তুময় নয়, ভাবঘনও বটে, প্রতীকবস্তুর মাধ্যমে আমরা এক ভাবমণ্ডলে পৌঁছই, আর এ ভাবমণ্ডলে যুগপৎ মনন ও অনুভাবন দুই-ই সক্রিয়।'

কোনটা বাক্‌প্রতিমা কোনটা প্রতীক, সেটা স্থির করতে হয়। দুয়ের মধ্যে ভুল হওয়া বিচিত্র নয় কারণ দুই-ই বলতে গেলে একই পর্যায়ের। যখন কোনো শব্দে সাধারণ এমন কি সংলগ্ন অর্থব্যঞ্জনা ছাড়িয়ে একটা ভিন্ন ভাব বা চিন্তার 'অধ্যারোপ' ঘটে তখন সেই শব্দটি হয়ে ওঠে প্রতীক। অমিয় চক্রবর্তীর বিখ্যাত কবিতা থেকে অমলেন্দু বসু দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন 'ঝোড়ো হাওয়া', 'পোড়ো বাড়ি', 'ভাঙা দরজা'—এ সবই হচ্ছে প্রতীক। কারণ কথিত শব্দের সঙ্গে কবির উদ্দিষ্ট চিন্তার কোনোই যোগ নেই—সেই শব্দগুলিতে লেখকের চিন্তার 'অধ্যারোপ' হয়েছে। এ ভাবে তিনি জীবনানন্দ দাশ থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে কাব্যত্ব প্রমাণ করেছেন। অজিত দত্তের 'খাণ্ডব দাহন' কবিতার তিনি প্রতীকী বিচার করে দেখিয়েছেন মহাভারতের অতিরিক্ত অর্থব্যঞ্জনা। রূপকের সঙ্গে প্রতীকের পার্থক্য এই যে রূপক একটা নির্দিষ্ট ভাব বা চিন্তার প্রতিরূপ, আর প্রতীক হচ্ছে a focus of relationships চর্য্যাপদে বাউলের গানে আমরা যে প্রতীক পাই তাকে তিনি বলেছেন 'আমমহলী' অর্থাৎ সাধারণ অভিজ্ঞতা দ্যোতক শব্দের ব্যবহার, আর কবি যখন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে প্রতীকী শব্দ ব্যবহার করেন তখন সে হয় 'খাসমহলী'।

এ পর্যন্ত সমালোচনার যে রীতি পদ্ধতি অমলেন্দু বসু আলোচনা করলেন, সে সবই শব্দশৈলী ঘটিত। সর্বশেষ যে সমালোচনাপদ্ধতির আলোচনা তিনি করেছেন, তাকে বলেছেন 'মনস্তাত্ত্বিক'। মনোবিদ্যাচর্চ্চার প্রসারের সঙ্গে এই শিল্প ও সমালোচনার যোগ। আমরা আজকাল ভাবতে শিখেছি যে 'মানবসত্তার প্রকৃত পরিচয় স্থূল ঘটনায় নয়, প্রকৃত পরিচয় মনোবৃত্তির প্রবাহী ধারায়। অতএব এই প্রবাহী ধারা আধুনিক শিল্পের বিষয়বস্তু'। এর থেকেই চিত্রশিল্পে এবং সাহিত্যে সুররিয়ালিজম। কবিতাকে বিচার করা যায় মনোবিদ্যার জ্ঞানে অভিজ্ঞ হয়ে। জীবনানন্দ দাশের কবিতা থেকে তিনি তার বিশেষত্ব দেখিয়েছেন এবং বলেছেন 'সাহিত্যের প্রকরণ হিসাবে মৌন স্বগতোক্তি আধুনিক সাহিত্যে অতীব মূল্যবান আর এ-প্রকরণের উৎস মনোবিদ্যায়'।

এই প্রসঙ্গে অমলেন্দু বসু ভাবানুষঙ্গ—এর বিষয়টিকেও নিয়ে এসেছেন। এ-বিষয়টি মূলত মনোবিদ্যারই বিষয়। উনিশ শতকে হার্টলী এবং কোলরিজ সাহিত্যে তার প্রয়োগ করেছিলেন। বিশ শতকের গোড়ায় ফ্রয়েডের অনুসন্ধানের ফলে এটি আরও স্পষ্ট এবং বিজ্ঞানসম্মত হয়ে ওঠে। অবচেতন মনের ক্রিয়া রূপে ভাবানুসঙ্গ কবিতায় একটা প্রকরণে পরিণত হয়। অমলেন্দু বসু রবীন্দ্রনাথের শিশুতীর্থ থেকে তার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। সমর সেন বিষ্ণুদের কবিতাতে এই

প্রকরণের ব্যবহার দেখিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে বিষ্ণু দের 'ক্রেসিডা' সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য এই যে ভাবানুষঙ্গ এলোমেলো স্তবকে স্মৃতির টুকরো মাত্র নয়, ভাবানুষঙ্গের সমাবেশেও প্যাটার্ণ থাকা উচিত, যা ক্রেসিডায় তিনি পাননি।

বাংলা সাহিত্যে অধ্যাপক অমলেন্দু বসু নিউ ক্রিটিসিজমের বৈজ্ঞানিক আলোচনা এবং তার প্রয়োগের আদর্শ স্থাপন করে গিয়েছেন। এই সমালোচনা অনাধুনিক সাহিত্যেও প্রযোজ্য—বস্তুত উৎকৃষ্ট সাহিত্য মাত্রেই এই আদর্শের মানদণ্ড প্রয়োগ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের কবিতা বিশ্লেষণ করে এ বিশ্বাসের সার্থকতা তিনি প্রমাণ করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রপরবর্তী আধুনিক কবিতার যথার্থ সমালোচনাশাস্ত্র যে হয়ে উঠতে পারে এই সমালোচনাপদ্ধতি, অমলেন্দু বসুর আলোচনা তার পথ প্রদর্শন করল। এ বিষয়ে বলবার যোগ্যতা তাঁর মতো অসামান্য সাহিত্যাধ্যাপকেরই ছিল। একদা যে-কবিরা বাংলায় আধুনিক যুগের আরম্ভ করেছিলেন, অমলেন্দু বসু ছিলেন তাঁদের ঘনিষ্ঠ সহপাঠী এবং সতীর্থ। ইংরেজি সাহিত্যের অসাধারণ পণ্ডিত অমলেন্দু বসু আশ্চর্য ভাবে সাহিত্যিক গোঁড়ামী থেকে মুক্ত ছিলেন। গ্রীক সাহিত্য, শেকসপীয়র, রোমান্টিক সাহিত্য, যুদ্ধ-পরবর্তী আধুনিক সাহিত্য—এতো কেবল কয়েকটি সুপরিচিত সর্বজ্ঞাত বিষয়। অমলেন্দু বসুর সাহিত্যিক জ্ঞান ছিল য়ুরোপ এবং ভারতবর্ষের সাহিত্যের নানা শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত। তাঁর সাহিত্যজ্ঞানের পরিপূর্ণ পরিচয় মাত্র কয়েকটি প্রবন্ধে ধরা পড়ে না ঠিকই, কিন্তু তার থেকেই তাঁর তথ্যসংগ্রাহী এবং সৌন্দর্য-সন্ধানী মনের আভাস মেলে। তাঁর সাহিত্যবোধে প্রাচীন এবং আধুনিকের কালগত বিভাজন ছিল কিন্তু উপলব্ধিতে বিভাজন ছিল না তাই সনাতনপন্থী পাঠকও অমলেন্দু বসুর আধুনিক কাব্যের আলোচনায় আবিষ্ট হন।

কবিতা অকবিতা শুদ্ধকবিতা

সম্প্রতি রবীন্দ্রকবিতার একটি নতুন সংকলন বিশ্বভারতী প্রকাশ করেছেন 'সূর্যাবর্ত' নামে। এতে অধিকাংশ কবিতাই সঞ্চয়িতার ; রবীন্দ্রনাথের এমন কবিতাও এতে দেওয়া হয়েছে যা সঞ্চয়িতায় ছিল না। সংকলয়িতা শঙ্খ ঘোষ জানাচ্ছেন—

'ছোটো বড়ো নানা মাপের প্রায় পাঁচশোটি কবিতা পাওয়া যাবে সঞ্চয়িতায়, আর এ সংকলনে আছে দুশো বাহাত্তরটি, যার মধ্যে একশো তিরিশটি রচনা সঞ্চয়িতারই অন্তর্গত।'

এই একশো বেয়াল্লিশটি কবিতা কীসের ভিত্তিতে নেওয়া হল সে সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য : 'আমাদের অনেক প্রিয় কবিতা (কখনো কখনো কবির নিজেরও যা প্রিয়) এই সঙ্কলনে পাই না আমরা, পাই না 'ভাষা ও ছন্দ' বা 'পতিতা'র মতো সমৃদ্ধ রচনাগুলি, 'কড়ি ও কোমল' থেকে পনেরোটি কবিতা গৃহীত হলেও সেখানে দেখতে পাই না 'যৌবনস্বপ্নে'র মতো মেদুর কবিতা : 'আমার যৌবন স্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ / ফুলগুলি গায়ে এসে পড়ে রূপসীর পরশের মতো।'

একথা সত্য। অনেক প্রসিদ্ধ সুপরিচিত কবিতা যা আমাদের মুখে মুখে চলে এসেছে, সঞ্চয়িতা খুলে তা দেখতে না পেয়ে হতবুদ্ধি হতে হয়। কবি স্বয়ং সেই কবিতাগুলি সঞ্চয়িতার জন্য নির্বাচন করেননি, ভালো হয়নি বলে নয় 'মনের অবস্থা পরিবর্তন হয়, মনোযোগের তারতম্য ঘটে' বলে। তার সঙ্গে আছে আয়তনের প্রশ্ন।

রুচির কথাটাই জরুরি। আমার জনৈক কাব্যরসিক বন্ধু মন্তব্য করলেন 'ভারততীর্থ' কবিতাটিকে কেন স্থান দেওয়া হল সূর্যাবর্তে? ভারততীর্থ কি কবিতা হয়েছে? এ রকম সংশয়ের কথা অবশ্য আমি এই প্রথম শুনলাম। বন্ধুর এই প্রশ্নে উত্তেজিত না হয়ে ভাবতে চেষ্টা করলাম কবিতা তা হলে কী? বন্ধুটি মনে করেছেন নতুন করে যখন রবীন্দ্রকাব্যের সংকলন হচ্ছে তখন একালের কবিতারসিক যা শুদ্ধ কবিতা বলে তাঁর মনে হয় সেই কবিতাই নির্বাচন করবেন। যা শুদ্ধ কবিতা নয় তাকে কেন স্থান দেবেন নতুন সংকলনে। সূর্যাবর্তের সংকলয়িতা কী ভেবেছেন জানি না, কবিতার মান নিয়ে তিনি আলোচনা করেননি। সঞ্চয়িতার মধ্যে বহু অ-কবিতাও ঢুকে পড়েছে এরকম সংশয় তাঁর নাতিদীর্ঘ ভূমিকায় কোথাও করেননি। সঞ্চয়িতার তৃতীয় সংস্করণ (১৩৪৪) পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ নিজেই কবিতা নির্বাচন করে গিয়েছেন। একালের কাব্য-রসিকের কাছে তার কোনো কোনো রচনাকে অকবিতা বলেও মনে হতে পারে যেমন ভারততীর্থকে মনে হয়েছে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজে কি ভাবতেন জানি না। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যে-কবিতাগুলি নির্বাচন করে গিয়েছেন, তার মধ্যে অকবিতাও অনেক আছে, এমন কথা সাহস করে কেউ বলেননি, শঙ্খ ঘোষও সংকলনের সময় অকবিতা বলেই সঞ্চয়িতার অনেক কবিতা

বাদ দিয়েছেন—এমন কথা বলেননি। তিনি বলেছেন সূর্যাবর্ত সঞ্চয়িতার বিকল্প নয়, পরিপূরক। অবশ্য কথাটার মধ্যে একটু ফাঁক থেকে যাচ্ছে। পরিপূরকই যদি হবে তবে সঞ্চয়িতা-ধৃত কবিতাগুলি আবার এখানে দেওয়া হল কেন। সঞ্চয়িতায় নেই শুধু সেই সব কবিতা দিয়েই তার পরিপূরণ করা যেত।

নির্বাচন ব্যাপারটা অবশ্য আমাদের আলোচ্য নয়। আমাদের আলোচ্য কাব্যরুচি। এ-প্রসঙ্গে সঞ্চয়িতার ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছেন তার কিছু উদ্ধৃত করছি—

'যাঁরা আমার কবিতা প্রকাশ করেন অনেকদিন থেকে তাঁদের সম্বন্ধে এই অনুভব করছি যে, আমার অল্প বয়সের যে-সকল রচনা স্খলিত পদে চলতে আরম্ভ করেছে মাত্র, যারা ঠিক কবিতার সীমার মধ্যে এসে পৌঁছয়নি, আমার গ্রন্থাবলীতে তাদের স্থান দেওয়া আমার প্রতি অবিচার।...

বন্ধুরা বলেন, ইতিহাসের ধারা রক্ষা করা চাই। আমি বলি, লেখা যখন কবিতা হয়ে উঠেছে তখন থেকেই তার ইতিহাস।

সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাতসংগীত, ছবি ও গান, এখনো যে বই-আকারে চলছে, একে বলা যেতে পারে কালাতিক্রমণ-দোষ।

ইতিহাস-রক্ষার খাতিরে এই সংকলনে ওই তিনটি বইয়ের যে কয়টি লেখা সঞ্চয়িতায় প্রকাশ করা গেল তা ছাড়া ওদের থেকে আর কোনো লেখাই আমি স্বীকার করতে পারব না। ভানুসিংহের পদাবলী সম্বন্ধেও সেই একই কথা।'

রবীন্দ্রনাথ কবিতা বলে স্বীকার না করলেও সূর্যাবর্তে সন্ধ্যাসঙ্গীত থেকে আছে 'তারকার আত্মহত্যা' প্রভাতসঙ্গীত থেকে আছে 'মহাস্বপ্ন' ছবি ও গান থেকে আছে 'পূর্ণিমায়'। কড়ি ও কোমল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'সেই পর্বে আমার কাব্য-ভূসংস্থানে ডাঙা জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে।' দেখা যাচ্ছে কবি স্বয়ং যাকে কবিতা বলেই স্বীকার করতে চাইছেন না, তাকে কবিতা বলে মেনে নিয়েছেন একালের সংকলয়িতা। এই রুচিপার্থক্যের বস্তুগত কারণ নির্দেশ করা সত্যই কঠিন। সূর্যাবর্তের ভূমিকায় এ ব্যাপারটি সম্বন্ধে কোনো বক্তব্য নেই। কোনটা কবিতা, কোনটা অকবিতা, এবং কোনটা শুদ্ধ কবিতা—এ বিতর্কের মধ্যে সংকলয়িতা প্রবেশ না করে ভালোই করেছেন কিন্তু পাঠকদের মধ্যে যে এ বিষয়ে কৌতূহল জাগবে, সেটাও স্বাভাবিক, বিশেষত রবীন্দ্রনাথের কবিতার সূত্রে। কারণ রবীন্দ্রনাথ কবিতার মান স্থাপন করে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের নিজের কবিতাই যদি আজকের পাঠকের কাছে অকবিতা বলে মনে হয় তবে সমস্যা বাড়ে। রবীন্দ্রনাথ যে-সময় থেকে কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন সে-সময়ে আরও কবি ছিলেন, তাঁদের কবিতা বিদ্যালয়পাঠ্য হয়ে আছে—কবিতা না অকবিতা এ-সম্বন্ধে প্রশ্নই ওঠে না। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পরে এটা বিবেচ্য হয়েছে এটাই লক্ষ্য করবার।

উনিশ শতকের শেষে বিশ শতকের গোড়ায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা নিয়েও পাঠকমহলে নানা বিতর্কের কথা আমাদের মনে পড়বে। 'সোনার তরী' কবিতাটার

কাব্যমূল্য নিয়ে সংশয় ছিল। এই কবিতার মধ্যে নানা তথ্যগত অসঙ্গতির উল্লেখ করা হত। শ্রাবণ মাসে ধান কাটা কখনও হয় না। ওই তরণীটার অর্থই বা কী, যে নৌকা চালিয়ে আসছে সে স্ত্রী না পুরুষ —ইত্যাকার নানা প্রশ্ন মনে এসে কবিতার আস্বাদনকে দ্বিধাগ্রস্ত করত। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের কবিতা নিয়ে উঠেছে নীতি-দুর্নীতির কথাও। আজ আমরা ভাবি এসব কি কবিতার মান? কবিতা এসব তথ্য নীতি আদর্শের অতীত একটা কিছু। রবীন্দ্রনাথের কবিতা লেখার প্রথম যুগে এই সব প্রসঙ্গই কবিতায় প্রাধান্য পেয়েছে। বক্তব্যই যেন কাব্যত্বের মাপকাঠি।

এ-বিষয়ে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই সন্দিহান ছিলেন। ভারতীতে তিনি লিখেছিলেন 'বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা'। তিনি কবিতাকে দুই জাতে ভাগ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নিজের আকর্ষণ ছিল ভাবগত কবিতার প্রতি। তাঁর তখনকার কথায়:

'ভাবুক লোক মাত্রেই অনুভব করিয়াছেন যে, আমরা মাঝে মাঝে এক প্রকার বিষণ্ণ সুখের ভাব উপভোগ করি, তাহা কোমল বিষাদ, অপ্রখর সুখ। তাহা আর কিছু নয়, সীমা হইতে অসীমের প্রতি নেত্রপাত মাত্র। কোন্ কোন্ সময়ে আমাদের হৃদয়ে ঐ প্রকার ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলেই উক্ত বাক্যের সত্যতা প্রমাণ হইবে। জ্যোৎস্না রাত্রে, দূর হইতে সঙ্গীতের সুর শুনিলে, সুখস্পর্শ বসন্তের বাতাস বহিলে, পুষ্পের ঘ্রাণে, আমাদের হৃদয় কেমন আকুল হইয়া উঠে—উদাস হইয়া যায়।'

এ কেবলই একটা অস্পষ্ট অস্ফুট অনুভূতি। মনের একটি বোধ মাত্র, বক্তব্য নয়। এ রকম একটা অব্যক্ত ব্যাকুলতার প্রকাশকে বলা হয়েছে ভাবগত কবিতা। রবীন্দ্রনাথ যে-সময় এ শ্রেণীর কবিতার ব্যাখ্যা দিতে চাইছেন প্রায় সেই সময়ে তিনি লিখছেন:

> আমার যৌবনস্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ।
> ফুলগুলি গায়ে এসে পড়ে রূপসীর পরশের মতো।
> পরানে পুলক বিকাশিয়া বহে কেন দক্ষিণা বাতাস
> সেথা ছিল যত বিরহিণী সকলের কুড়ায়ে নিশ্বাস।
> বসন্তের কুসুমকাননে গোলাপের আঁখি কেন নত?

এতে আসলে কোনো স্পষ্ট বক্তব্য নেই, আছে কেবল ইমোশন। মানুষের দেহে যৌবন এলে মনে যে-অনুভূতি জাগে এ কবিতায় কবি সেই অনুভূতিটাকেই ব্যক্ত করতে চেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের একেবারে শেষের দিকের একটা কবিতা নেওয়া যাক:

> এ আমির আবরণ সহজে স্খলিত হয়ে যাক,
> চৈতন্যের শুভ্র জ্যোতি
> ভেদ করি কুহেলিকা
> সত্যের অমৃত রূপ করুক প্রকাশ।

সর্ব মানুষের মাঝে
এক চিরমানবের আনন্দকিরণ
চিত্তে মোর হোক বিকীরিত।

দুই কবিতাই স্বগতোক্তিমূলক। প্রথমটিতে আছে একটা অনুভূতি, দ্বিতীয়টিতে একটা চিন্তা। প্রায় পঞ্চান্ন বছরের ব্যবধানে দুটি কবিতা রচিত। কিন্তু দুয়েরই বৈশিষ্ট্য স্বগত ভাষণ, কখনও অনুভূতি মাত্র, কখনও চিন্তা। রবীন্দ্রনাথ কবিতাকে বিষয়-গুরুত্ব থেকে মুক্ত করেছেন। তাঁর কবি জীবনের মধ্যবর্তী সময়ে এক সময়ে তিনি লিখেছিলেন মহাকাব্যের কল্পনা হাজার গীতে ফেটে পড়ল। সেই স্বীকৃতি কবিতার ধর্মেরই স্বীকৃতি। এই লিরিক সুর বিষয়ের স্থূলতাকে বর্জন করে কখনও ভাব কখনও চিন্তাকে নানা শব্দে, ইঙ্গিতে সংকেতে ব্যক্ত করেছে। উপরে উদ্ধৃত দুটি কাব্যাংশের মধ্যে অবশ্য যথেষ্ট প্রকৃতিগত ভেদ আছে। প্রথমটি ইন্দ্রিয়ানুভূতিমূলক যেমন স্পর্শানুভূতির স্মৃতিতে যৌবন-বেদনাকে ফুটিয়ে তোলা। দ্বিতীয়টিতে একটা মানসক্রিয়া, কোনো ইন্দ্রিয়ানুভবের ব্যাপার তাতে নেই।

প্রশ্ন এই যে, কবিতা কি শুধুই বিষয়বর্জিত অনুভূতি বা চিন্তারই ভাষারূপ? কবিতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণাটা গড়ে উঠেছে ফরাসী কবি বোদলেয়ার ম্যালার্মে র‍্যাঁবোর প্রভাবে। ম্যালার্মে বলতেন Poetry is the expression by means of human language restored to its essential rythm, of the mysterious sense of the aspects of existence. আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গীতকে ধ্বনিত করে তোলাকেই বলে কবিতা। ধ্বনিত করতে হয় শব্দ দিয়ে, স্থূলার্থক শব্দ নয়, নানা শব্দ জুড়ে একটা সামগ্রিক অনুভূতিলোক রচনা। এর থেকেই শুদ্ধ কবিতার ধারণা তৈরি হয়ে উঠল। এতে কবিতার সঙ্গে সঙ্গীতের ভেদ কমে এল। রবীন্দ্রনাথের মতো আত্মধর্মী কবির পক্ষেই সম্ভব ছিল সেকালের পরিমণ্ডলের মধ্যে থেকেই শুদ্ধ কবিতার স্বপ্ন দেখা। রবীন্দ্রনাথ জগৎটাকে অর্থাৎ ওই mysterious sense of the aspects of existence কে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন নানা উপমায় সাদৃশ্য-রচনায় ভাষাভঙ্গিতে। আবার তিনিই যখন চৈতন্যের বহিরাবরণ সরিয়ে সত্যের শুভ্র জ্যোতিকে সর্বমানবের মধ্যে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেন তখন একটা উপলব্ধির গভীরতা ফুটে ওঠে। সেই উপলব্ধির গভীরতা আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করে, কিন্তু তাতে কোনো অনুভূতির আনন্দ নয়, সত্যবোধের একটা বিশ্বাস জন্মায়। দার্শনিকের উপলব্ধির সঙ্গে তুলনীয় হলেও এটা যুক্তিবিচারের কথা নয় তাই এর মধ্যে কবিতার মতোই একটা অনুভূতির সত্যও আছে যদিও তা ইন্দ্রিয়গত নয়। তাই এ-কবিতাকে শুদ্ধ কবিতা বলা যাবে না। রবীন্দ্রনাথের কবি জীবনের প্রথম দিকটায় অন্তত গীতাঞ্জলি পর্যন্ত শুদ্ধ কবিতা রচনার দিকেই তাঁর একটা স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা যায়। শুদ্ধ কবিতায় বিষয়টা প্রায় কিছুই নয়, অনু-ভূতিটাকে ধ্বনিত করে তোলাই আসল।

কথাটা অত্যুক্তি হল কী? বিষয় ছাড়া কি কবিতা কেন, কোনো কিছুই রচনা

সম্ভব? [illegible] বিষয় থাকবেই। তবে শুদ্ধ কবিতাতে বিষয়টা কবি-মনের প্রকাশের অবলম্বন মাত্র। কবি-মনের অনুভূতিই প্রধান। তাকে অনুভব করতে পারলে কবিতার আস্বাদন সার্থক হয়। সেই অনুভূতি যদি না জাগে, কবির বিষয়বস্তু এবং স্থূল বক্তব্যটাই যদি সর্বাগ্রে এবং সর্বতোভাবে চোখে পড়ে, তবে তাকে শুদ্ধ কবিতা বলতে পারি না। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝানো যাক—

মাঠের পরে মাঠ, মাঠের শেষে
সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে।

এখানে বিষয়বস্তু হচ্ছে প্রসারিত মাঠের শেষে একটি গ্রামের ছবি। কিন্তু মাঠের শেষে গ্রাম আছে, এই বক্তব্যটাই কবিতা নয়। এখানে আছে ছন্দের সূক্ষ্মদোলা—মাঠের পরে মাঠ / মাঠের শেষে—যার ফলে প্রসারণের চেহারাই দৃশ্যেন্দ্রিয়গোচর হল। তাছাড়া 'আকাশে মেশে' এই শব্দ ব্যবহারের মধ্যে দৃশ্যেন্দ্রিয়ের আর এক অনুভূতি জেগে উঠল ; এদের অনুপ্রাস এবং 'মেশে' শব্দটার বিশেষ ধরণের ব্যবহারের ফলে। এ দুই পঙক্তিতে বিষয়বস্তুকে ছাপিয়ে গেছে কবির দৃশ্যানুভূতির বিস্ময়বোধ।

এরকম কবিতাও কম নেই রবীন্দ্রনাথের, যেখানে ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধুর্য সঞ্চারের চেয়ে বিষয়গৌরবও কোনো অংশে কম নয়। শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন এমন কোন কবি আছেন যার কোনো কবিতাতেই বক্তব্য এবং বিষয় একেবারেই পরোক্ষ হয়ে পড়েছে? রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ' কবিতা সুপরিচিত। এ-কবিতায় ভারতবর্ষ-মহিমাকে নভোস্পর্শী করে তোলা হয়েছে। এ-কবিতায় বক্তব্য সুস্পষ্ট। এই ভারতবর্ষ হচ্ছে বহু মানবের মিলনস্থল। ভারতের সাধনা হচ্ছে বহুকে একের মধ্যে মিলিয়ে দেওয়া, উপনিষদের চিন্তাধারায়, ঋষিদের তপস্যায় একমেবাদ্বিতীয় ব্রহ্মকে উপলব্ধি যেমন ছিল লক্ষ্য, ভারতীয় সভ্যতার লক্ষ্যও হচ্ছে বহু মানবজাতিকে এখানে নিয়ে এসে এক মহামানবজাতি গড়ে তোলা। তাই অতীতে এসেছে শক হুন পাঠান মোগল, একালে এসেছে ইংরেজ। কবিতায় এই বক্তব্যটিকে কবি অতি চমৎকার করে ফুটিয়ে তুলেছেন। অবশ্যই সকলের মনে পড়বে রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন ভারতইতিহাসচিন্তারও মূল কথাটা ছিল এটাই। যে বক্তব্যকে তিনি প্রবন্ধে বিস্তৃত করেছেন, সেই বক্তব্যকেই তিনি কবিতায় সংহত করে নিয়ে এসেছেন। দুই-ই রবীন্দ্রনাথের জীবনের একই পর্বের রচনা।

কবিতায় বিষয় বড় হয়ে উঠলে সেটা যে আর কবিতা থাকে না, তার দৃষ্টান্ত সুপ্রচুর। এর দৃষ্টান্ত হিসাবে শুদ্ধ কবিতাবাদীরা হেমচন্দ্রের 'ভারতভূমি' বা সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি' উল্লেখ করবেন। এসব কবিতার মধ্যে ইন্দ্রিয়ানুভূতির সেই যাদুসৃষ্টি নেই, আছে ইতিহাসের কতকগুলি তথ্য বা কতকগুলি আদর্শবাদের ছন্দে প্রকাশ। এর ভাষা বা শব্দযোজনাতে কোনো বিশিষ্ট অনুভূতি জেগে ওঠে না। আমাদের জ্ঞানের জগতে কয়েকটি তথ্যের স্মৃতি সঞ্চিত হয় মাত্র। যিনি ভারততীর্থের মতো কবিতাকে অকবিতা বলতে চান, তিনি আসলে

ওই শ্রেণীর কবিতার কথা মনে করেই ভারততীর্থকেও অকবিতা বলেন। ভারততীর্থের মধ্যে কবির বক্তব্যটা বড়ো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সেই কারণে একে শুদ্ধ কবিতা বলা যাবে না। কিন্তু 'ভারততীর্থ' কি অকবিতা? অর্থাৎ কবিতা নয়? রবীন্দ্রনাথের এমন অনেক কবিতা আছে যাতে বক্তব্যর গুরুত্ব যথেষ্ট। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার প্রথম দিকটা কিংবা 'যেতে নাহি দিব' কবিতার প্রথম দিকটা বক্তব্যভারগ্রস্ত। দ্বিতীয় কবিতার ওই অংশটা ছোটগল্পের লক্ষণাক্রান্ত। এই দুটি কবিতাই সূর্যাবর্তে আছে। এই দুটি কবিতাই সঞ্চয়িতাতেও ছিল। এ রকম বহু দৃষ্টান্ত আছে যেগুলিকে আমরা শুদ্ধ কবিতার পর্যায়ে ফেলতে পারি না। আবার 'দুই বিঘা জমি' কবিতাটি সঞ্চয়িতায় আছে, সূর্যাবর্তে নেই। বুদ্ধদেব বসু এটিকে কবিতা বলতে চাননি। সঞ্চয়িতায় 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতাটি নেই দেখে সূর্যাবর্তের সংকলয়িতা বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, অথচ ওই কবিতাটিতে বক্তব্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। কোনো তরুণ সমালোচক 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় বর্ণনার বাগাড়ম্বর দেখে কৌতুক প্রকাশ করেছেন। রুচিভেদ বলে এ আলোচনা পরিত্যাগ না করে কবিতার ধর্ম নিয়ে কোনো প্রকৃতি বা নীতি নির্দেশ করা যায় কিনা দেখা যাক।

শুদ্ধ কবিতাকেই যদি একমাত্র কবিতাপদবাচ্য বলে ধরতে হয়, তবে মানুষের বিপুল সৃষ্টিকেই যে হারাতে হয় তাতে সন্দেহ নেই। বলা বাহুল্য এ বিষয়ে প্রথম সাক্ষ্য নিতে হবে রসিকেরই কাছে। রসিকের মধ্যেও রুচিভেদ হতে পারে অবশ্যই, তবু প্রামাণ্য করতে হবে রসিকের মার্জিত রসবোধকেই। রসিক কে, এ-প্রশ্ন এখানে অনাবশ্যক। 'দুই বিঘা জমি'র মতো কবিতা রবীন্দ্রনাথের রুচিতে কবিতাপদবাচ্য হয়ে সঞ্চয়িতায় স্থান পেয়েছে। তাই বলে রবীন্দ্রনাথের রসবোধকে কি সংশয় করা চলে? বিষয়টিকে দেখতে হয় অন্য দৃষ্টিকোণে। এতে কবিতার আকৃতির চেয়ে শেষ রসনিষ্পত্তিটাই কবির কাছে বিচার্য ছিল মনে হয়, সংস্কৃত রসতাত্ত্বিকেরা যেমন ফর্মের উপর জোর না দিয়ে রসনিষ্পত্তির উপর সবটুকু জোব দিতেন। 'কথা' কাব্যের কাহিনীমূলক কবিতার সঙ্গে 'দুই বিঘা জমি'র মতো কবিতার পার্থক্য কোথায়। 'দুই বিঘা জমি'তে গল্পের রসটা বড় কম নয়, বরং একটি নিটোল কবিতার সংহত রসানুভূতির চেয়ে ঘটনা এবং চরিত্রের বৈচিত্র্য মনকে জুড়ে থাকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এমন কাহিনীমূলক বা বক্তব্যমূলক কবিতা আছে যার প্রকাশের চারুতায়, ভাষাভঙ্গিতে পাঠক উপনীত হন একটা সংহত ভাবচেতনায়। এ-শ্রেণীর কবিতা অকবিতা নয়—অবশ্যই তা কবিতা। 'ভাষা ও ছন্দ' নামে বিখ্যাত কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ তাঁর নির্বাচনে স্থান দেননি বটে, কিন্তু এই কবিতার একটা বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্যও আছে। এই কবিতার মধ্যেই তিনি সচেতন ভাবেই জানিয়েছেন বক্তব্যের স্থূলতাকে অতিক্রম করে কী করে ভাষা কাব্যত্ব লাভ করে।

মানবের জীর্ণ বাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর,
অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে কিছু দূর

ভাবের স্বাধীন লোকে, পক্ষবান্ অশ্বরাজ সম
উদ্দাম সুন্দর গতি—সে আশ্বাসে ভাসে চিত্ত মম।

কবিতাটি লেখা হয়েছিল ১৮৯৮তে। তখন উনিশ শতকের কবিতা রচনার আদর্শকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব কাব্যরীতি দিয়ে বদলে দিচ্ছেন এ-কবিতায় আছে তারই সূত্র। রবীন্দ্রপূর্ব কবিতায় ভাষার পুনর্নির্মাণের রহস্যই ছিল না। কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটা বক্তব্য আছে। এই বক্তব্যকেই মূল রেখে 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতাটি রচিত। শুধু এইটুকু বক্তব্যই যদি থাকত তবে এটা হত অকবিতা। কিন্তু সমস্ত কবিতাটির মধ্যে নানা ইঙ্গিতময় বর্ণনায় এই বক্তব্যই রূপবান হয়ে উঠেছে বলেই 'ভাষা ও ছন্দ' চমৎকার কবিতা। তেমনি ভারততীর্থের 'ধ্যান গম্ভীর ভূধর' বা 'নদীজপমালাধৃত প্রান্তর' ইত্যাদি শব্দযোজনা থেকে একটা সামগ্রিক ভাবচিত্র পাঠকের মনে তৈরি হয়ে যায়—বক্তব্যটাই হয়ে যায় রূপরসময়। একটা বড়ো আইডিয়া আছে বলে ভারততীর্থ কবিতা নয়, একটা গভীর অনুভূতিময় চিত্র আছে বলেই ভারততীর্থ কবিতা।

কিসে কবিতা হয়, একথা যেমন নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন, তেমনি কবিতা এবং শুদ্ধ কবিতার সূক্ষ্ম সীমারেখা নির্দেশ করাও কঠিন। রবীন্দ্রনাথ বিক্ষিপ্তভাবে এখানে ওখানে নানা ইঙ্গিত রেখে গেছেন, পণ্ডিতেরাও এ নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। কিন্তু আলোচনার চেয়ে কবিতা পড়ে নেওয়াই ভালো। পড়তে গেলেই হয়তো দেখা যাবে যে-কবিতাকে ভালো লাগছে, আমাদের সংজ্ঞায় তাকে ঠিক ফেলা যাচ্ছে না। কোনো লেখকের মতে সঞ্চয়িতা পাঁচমিশালী কবিতার সংকলন, এতে নানা দিক মনে রেখে ভালোর সঙ্গে মন্দকে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। অনেক অকবিতা ঢুকে পড়েছে কবিতার সঙ্গে। সূর্যাবর্তের প্রশ্ন রয়েই গেল। 'দেবতার গ্রাসে'র মতো কবিতা কী গল্প না কবিতা? এখনও সে প্রশ্নের উত্তর অমীমাংসিত রইল। অনেক আধুনিক রসিক মনে করেন রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কবিতাগুলি অসামান্য। সংজ্ঞা প্রয়োগ করে দেখা যাবে তাতে দার্শনিক বক্তব্যই উচ্চারিত হয়েছে ফলে শুদ্ধ কবিতার স্তরে উন্নীত হয়নি। অথচ 'আরোগ্য' 'রোগশয্যা'র কবিতার আশ্চর্য সংক্ষিপ্ততা ও সংহতি সৃষ্টি করে তুলেছে আর এক উৎকর্ষ—এই কবিতাকেই অমিয় চক্রবর্তী বলেছিলেন মন্ত্রের মত—কবিতার চেয়ে বেশি। তার মানে কি এই যে তারা কবিতার চেয়ে বেশি, কিন্তু কবিতা নয়?

কবিতায় শব্দ ও তত্ত্ব

ম্যালার্মে বলেছিলেন, কবিতা ভাব দিয়ে হয় না, হয় শব্দ দিয়ে। আপাতদৃষ্টিতে এ উক্তি খুব সাধারণ বলেই মনে হবে। কেননা, শব্দ ছাড়া আবার কবিতা হবে কি করে। শব্দে সমর্পিত হলে তবেই কোনো ভাব কাব্যে পরিণত হয়। একথা আমাদের দেশের আলঙ্কারিকও বলে গেছেন। ভাবের প্রয়োজন আছে। কারণ ভাবটিকে শব্দে ধরে দিতে হবে। এর অর্থ এই নয় যে ভাবটিই কবিতা, শব্দের ভূমিকা গৌণ। ভাব প্রকাশ করে বলা যায় গদ্যেও। কিন্তু কবিতা ও গদ্য যে আলাদা তা কে না জানে।

ম্যালার্মের মতে কবিতায় শব্দই সর্বস্ব। ম্যালার্মের এই কথাটিকে ভুল বোঝার সম্ভাবনা আছে। শব্দকে বসিয়ে গেলেই কী কবিতা হয়। যে কোনো শ্রুতিসুখকর শব্দে কবিতা হতে পারে কি? অনেক ধ্বনিঝঙ্কৃত পঙ্‌ক্তি কবিতা হয়ে ওঠে না, এ রকম দৃষ্টান্ত প্রচুর। এ রকম মন্তব্য করার অবশ্য একটা বিপদ আছে। কবিতা কি, সে বিষয়ে একটা যেন সর্বজনবোধ্য, সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা আছে, ব্যাকরণে যেমন সংজ্ঞা থাকে। কিন্তু ওই সংজ্ঞা নিয়েই তো বিতর্ক। ভাব দিয়ে কবিতা হয় না, শব্দ দিয়ে কবিতা হয়—এই উক্তি দ্বারা ম্যালার্মেও কবিতার সংজ্ঞা দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু স্বীকার করতেই হবে সে সংজ্ঞাটি খুব পরিষ্কার নয়। সুধীন্দ্রনাথ ম্যালার্মের কাব্যাদর্শকে অন্বিষ্ট করে বলেছিলেন, 'আমিও মানি যে কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ'। একটু আগে তিনি বলেন 'আমার কাব্যজিজ্ঞাসায় আধার আধেয়ের অগ্রগণ্য'। এর অর্থ কী এই যে শুধু শব্দ রচনা প্রণালীতেই কাব্যত্ব? আঠারো শতকের কবিতার পর এই সংজ্ঞা যে অচল, তাঁর মতো আর কে জানতেন? ইংরেজি সাহিত্যে রোমান্টিকরা এসে গিয়েছেন। তাঁদের কবিতায় শব্দের গুরুত্ব শুধু শব্দযোজনার জন্যই নয়। শব্দযোজনাতেও একটা সঙ্গীত সৃষ্টির অভিপ্রায় থাকবে। It is the perfect handling of the mystery that constitutes the symbol ; to evoke an object little by little in order to show a state of mind or inversely to choose an object and to disengage from it a state of mind, by a series of unriddlings.

মনের ভাবময় অবস্থার প্রতীক করে তুলতে হবে শব্দকে। এর পিছনে অবশ্য কোনো অনুপ্রেরণার তুরীয়তা নেই, বরং সচেতন রূপরচনার চেষ্টা আছে শব্দ দিয়ে। সে জন্য কোনো আবেশে, কবিতা লেখা নয়, পরন্তু একটা সচেতন সৃষ্টিচিন্তাকে সতর্ক শব্দে ধরে দেওয়া। ম্যালার্মে বলেছেন, Poetry is the expression by means of human language restored to its essential rhythm, of the mysterious sense of the aspects of existence : it endows our sojourn with authenticity and constitutes the sole spiritual task.

শব্দকে কবিতার প্রাণ বলেও ম্যালার্মে তাকে নিযুক্ত করতে চেয়েছেন গভীরতর চিন্তাচৈতন্যের প্রকাশের কাজে। চিন্তাচৈতন্যবর্জিত ধ্বনিঝঙ্কারের কথা ম্যালার্মে বলেননি। এমন কি কবিমনের সঙ্গে নিগূঢ় যোগের কথাও তিনি অস্বীকার করেননি। রোমান্টিক যুগের কবিরা যা করতে চেয়েছিলেন, তার সঙ্গে ম্যালার্মের কাব্যাদর্শের ব্যবধান কতদূর?

তিনি রোমান্টিক যুগের অনুপ্রেরণার দৈবী শক্তিকে অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন। এটাই সম্ভবত ম্যালার্মের নতুন পদক্ষেপ আধুনিকতার দিকে। ওয়ার্ডসওয়র্থের spontaneous overflow of powerful feeling ব্যাপারটা রোমান্টিকদের পক্ষে যতই স্বাভাবিক হোক, পরবর্তী পর্যায়ের কবিরা অতটা আত্মহারা হতে চাননি। তাঁরা শব্দ প্রয়োগ করেছেন যথেষ্ট অনুধাবন করে—চিন্তাকে সচেতন নতুনত্বে প্রকাশ করবার জন্য শব্দকে প্রতীক করে তুললেন। শব্দ ঠিক অর্থগর্ভ নয়, ভাবগর্ভও নয়, কিন্তু চিন্তাগর্ভ হয়ে উঠল। এই ভাবেই গদ্য ও পদ্যের বিরোধ মেটাবার পথ খুলে গেল। কারণ চিন্তাগর্ভতা হচ্ছে গদ্যের লক্ষণ। সুধীন্দ্রনাথ যেমন বলেছিলেন 'সংবর্তে'র ভূমিকায় 'বিশ বৎসর যাবৎ আমি যদিও জ্ঞানত গদ্যপদ্যের নির্বিরোধ চাই, তবু এখনও আমার সাধ ও সাধ্য মাঝে মাঝে পরস্পরকে বাধ সাধে।' তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল পদ্যের ভাষা নামক কৃত্রিমতা থেকে কবিতাকে উদ্ধার করা। সেজন্য সতর্ক সচেতন শব্দ ব্যবহার তো থাকবেই, সেই শব্দ হবে আক্ষরিক অর্থে সার্থক। সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় তার দৃষ্টান্ত। তাঁর কবিতা আবেশের লেখা নয়, সচেতন শব্দবিন্যাসে লেখা, সে-সব শব্দও বুদ্ধিগত চিন্তায় ধারালো, অভিনব। তিনিও প্রেমের কবিতা লিখেছেন। তাঁর সে প্রেম আত্মস্থ, সুচিন্তিত এবং বিন্যস্ত।

অবশ্য ম্যালার্মে সুচিন্তিত শব্দ-ব্যবহার দিয়ে ভাবের একটা সাঙ্গীতিক আকৃতি দিয়েছেন, সুধীন্দ্রনাথ তার অন্ধ অনুকরণও করেননি। তাঁর চিন্তা, তাঁর বোধি, তাঁর নিজের; তাতে সাঙ্গীতিক সৌন্দর্য সন্ধান নিরর্থক। সুধীন্দ্রনাথের জগৎ বরং এলোমেলো, বাঁধা বিশ্বাস এবং নির্ধারিত ছকের বাইরে। তিনি সংবর্তের মুখবন্ধ শেষ করছেন এই বলে:

'অগত্যা বৈনাশিক ক্ষণবাদেই বর্তমান মুখবন্ধের সূচনা ও সমাপ্তি; এবং সে বিশ্ব-বীক্ষায় যেমন আত্মপ্রসাদের অবকাশ নেই, তেমনি তার মধ্যে প্রতিবিপ্লবী শ্রেণী স্বার্থের প্রত্যাদেশ খোঁজা পণ্ডশ্রম'।

ম্যালার্মে এবং সুধীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ এখানে আনা হল একাধিক কারণে। কবিরা কতখানি শব্দ সচেতন হয়েছেন, সেটা বোঝা দরকার। শব্দের কথা অবশ্য নতুন নয়। পুরনো কাব্যতত্ত্বজ্ঞেরা শব্দের গুরুত্ব বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। তার থেকেই ও দেশে রেটরিক আর এ দেশে অলংকার শাস্ত্রের সৃষ্টি। কাব্য রচনার জন্য শব্দের শুদ্ধ প্রয়োগ অবশ্য দরকার। সেই জন্য শব্দশাস্ত্রের গুরুত্ব। কাব্যশিক্ষার্থীর শব্দজ্ঞানও আবশ্যক। ক্লাসিক্যাল স্টাডি বলতে যা বোঝায় তা হচ্ছে সাহিত্য-

শরীরের জ্ঞান। রসের তত্ত্ব তৈরি হয়েছে, তবে শব্দ প্রয়োগের গুরুত্ব তাতে কিছু কমেনি।

কিন্তু যে শব্দচেতনার কথা ম্যালার্মে-সুধীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে, সে শব্দজ্ঞান আলাদা। পূর্বতন শব্দজ্ঞান ছিল রীতিবদ্ধ। এর প্রথাবদ্ধ ব্যাকরণ ছিল এবং সে-ব্যাকরণ ছিল বিদগ্ধজনের মধ্যে প্রচলিত সাধু ভাষার ব্যাকরণ। কাব্যের ভাষা আর জীবনের ভাষা আলাদা। জীবন ও কাব্য ভিন্ন। জীবনের সত্য এবং কাব্যের সত্যকেও ভিন্ন করেই ভাবা হয়েছে। জীবনে আমরা সে ভাষাভঙ্গি এলোমেলো ভাবে ব্যবহার করি, কাব্যে তা করি না! কাব্যে চাই পরিচ্ছন্ন শ্রুতিমধুর মার্জিত বিশিষ্ট শব্দ। তার উপমা তার অলংকার নিজস্ব রীতিতে প্রযুক্ত। কবিতায় এমন শব্দ ব্যবহৃত হয় যা গদ্যে চলে না, আবার রচনাভঙ্গিতেও গদ্যের রীতির থেকে পৃথক রীতির অনুসরণই ছিল প্রত্যাশিত। এই রীতি ছিল কাব্যভাষার। কবিতার ভাষা গদ্যের এবং মৌখিক নিত্যপ্রয়োজনের ভাষা থেকে ভিন্ন থাকাই ছিল স্বাভাবিক। এইসব বিশিষ্ট শব্দ ছাড়াও কবিতার ভাষা ও শব্দ প্রয়োগে পদ্যের ব্যাকরণ মোটের উপর মেনে চলতে হত।

অয়ি দীন হীনা,
অশ্রুআঁখি দুঃখাতুরা জননী মলিনা,
অয়ি মর্ত্যভূমি, আজি বহুদিন পরে
কাঁদিয়া উঠেছে মোর চিত্ত তোর তরে।

এখানে কাব্যেই ব্যবহৃত হয় এমন শব্দ 'অয়ি' এবং 'তরে'। গদ্যে আমরা লিখি 'কাঁদিয়া উঠিতেছে', কাব্যে বলা হচ্ছে 'কাঁদিয়া উঠেছে'। এই গুরুচণ্ডালী দোষ কাব্যের ভাষায় দোষ বলে গণ্য নয়। কিন্তু মোটের উপর এখানকার পদব্যবহার, শব্দপ্রয়োগ এবং বাক্যগঠনে এক আদর্শ ভাষারীতিকেই মেনে চলা হয়েছে। অশ্রুআঁখি এবং দুঃখাতুরা সমাসবদ্ধ শব্দ দুটিও সাধুরীতিসম্মত। এই প্রচলিত সর্বজনগ্রাহ্য ভাষারীতিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় অবলম্বন করেছেন।

এই রীতির মধ্যে দিয়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর অসাধারণ ভাবের জগৎ সৃষ্টি করেছেন। উপরে উদ্ধৃত পঙ্ক্তিগুলি বক্তব্যপ্রধান এবং ব্যঞ্জনাহীন। কিন্তু নীচের পঙ্ক্তিগুলি প্রচলিত ভাষারীতিকে রক্ষা করেও ভাবময়—

নামিছে নীরব ছায়া ঘন বনশয়নে
এ দেশ লেগেছে ভালো নয়নে।
স্থির জলে নাহি সাড়া ; পাতাগুলি গতিহারা
পাখি যত ঘুমে সারা কাননে—
শুধু এ সোনার সাঁঝে বিজনে পথের মাঝে
কলস কাঁদিয়া বাজে কাঁকনে।

এখানে একটিও শব্দ নেই যার সাধারণ ভাষায় ব্যবহার হয় না। প্রতি বাক্যই পদপ্রয়োগে ব্যাকরণসম্মত। 'কলস কাঁদিয়া বাজে কাঁকনে'—এই বাক্যটিতে একটি

খুব শিষ্টতাসম্মত তা না হতে পারে। কিন্তু 'যামিনী'—এই সাধু শব্দটির পরিবর্তে সাধারণ চলতি শব্দ ব্যবহার করা চলত কিনা পাঠক ভেবে দেখতে পারেন। এখানে বৈষ্ণব কবিতার ট্রাডিশনই কাজ করছে। শব্দপ্রয়োগের অনিবার্যতা আছে কবি-চেতনার মধ্যে, ট্রাডিশনে নেই, রুচিতেও নেই, ব্যাকরণেও নেই। একজন কবি লিখেছেন :

> লোকে তো কোথাও যাবে, তাই আসি, এমন কিছু নয়
> নিহিত পাতালছায়া ভরে ছিল আকাশপরিধি।
>
> —*শঙ্খ ঘোষ।*

দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে 'নিহিত পাতালছায়া' এই শব্দ দুটি সুন্দর, কিন্তু ব্যাকরণে এর অন্বয় পাওয়া শক্ত। অনেকটা অনুমান করে নিতে হয়। আজকের কবিতায় এই নিয়ে কেউ প্রশ্ন করবে না। শুধু শব্দসজ্জা থেকে একটা ছবি—সে রূপেরই হোক, অথবা ভাবেরই হোক—গড়ে তুলতে চাইবে। এইজন্য মনে হয় একালের কবিতায় শব্দকে আলাদা করে দেখা চলে না, দেখাও হয় পঙ্ক্তির সমগ্রতার পরিপ্রেক্ষিকায়। অবশ্য বিষ্ণু দে এক-একটা চিত্রকল্প দিয়ে অনেকটা কথা বলতে চান সত্য, কিন্তু চিত্রকল্পের অন্তর্গত শব্দটিকে আলাদা করে দেখলে তার কোনো মানে থাকে না। বোধহয় এখানেই কবিতাশিল্পের নতুনতর রীতি। শব্দ এবং পঙক্তির বন্ধনকে শিথিল করে দেখলে কবিতার উপভোগে হানি হয়।

সুতরাং ম্যালার্মে কবিতায় শব্দের গুরুত্বের কথা বলেছিলেন, তার পুরো তাৎপর্যটি বোঝা দরকার। সাঙ্গীতিক সাফল্যে পৌঁছনো ছিল তাঁর লক্ষ্য। সেটা চরিতার্থ হতে পারে শব্দের সাহায্যে। আজকের কবিতায় শব্দের মূল্য স্বীকৃত হলেও সাঙ্গীতিক লক্ষ্যকে কাব্যের একমাত্র সার্থকতা বলতে হবে এমন কথা সবাই মানবেন না। জীবনানন্দের কবিতায় সাঙ্গীতিক পূর্ণতা থাকলেও সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় শব্দসচেতনতা কোনো সাঙ্গীতিক পূর্ণতায় নিয়ে যায় না। কিন্তু সঙ্গীতকে লক্ষ্য না করেও যে গাঢ়তা আনা যায় তার দৃষ্টান্ত একালের কবিতায় প্রচুর।

যেমন :

> সমস্ত জীবন আজ আয়োজিত সমর্পিত নারী,
> অন্তরালবর্তী কোন যন্ত্রণায় শীতার্ত কাতর ;
> নৈরাশ্য নাগর তার, কামনার খর তরবারী
> সমুখে উদ্যত আর লুপ্তপ্রায় উদ্ভাসিত স্বর।
>
> —*কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত।*

—এই লাইন কয়টিতে শব্দ নিয়ে আলাদা করে বলার কিছু নেই। এতে প্রযুক্ত শব্দগুলি পূর্বযুগবাহিত। শুধু 'উদ্ভাসিত স্বর' চিত্রকল্পটিতে নতুনত্ব আছে। তবু এই কবিতার পঙ্ক্তি কয়টি প্রমাণিত করে শব্দকে অভিনব হতেই হবে, কবিতাপদবাচ্য

হওয়ার পক্ষে সেটা অত্যাবশ্যক নয়। বড়ো কথা এই যে, প্রচলিত শব্দগুলিতেই ফুটে উঠেছে যন্ত্রণাকাতর একটি হৃদয়ের ছবি। এই শব্দের ব্যবহার দ্বারা ছবিটি অবয়ব লাভ করেছে—শব্দগুলি স্পষ্ট, অর্থগর্ভ বিশেষ অর্থে ধ্বনিত। ধ্বনিত করতে পারছে বলেই শব্দের সার্থকতা।

উপরের এই কবিতা থেকে একটা সিদ্ধান্ত করা যায়। জীবনানন্দ শব্দপ্রয়োগের যে-স্বাধীনতা নিয়েছিলেন, তার সিদ্ধি যেদিক দিয়েই হোক, এই কবির শব্দজাত সিদ্ধি সেদিক দিয়ে নয়। সঙ্গীতে নয়, রূপরচনাতে তার দক্ষতা। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, বাংলা কবিতায় যিনি ম্যালার্মের প্রসঙ্গ এনেছিলেন এবং বলেছিলেন ম্যালার্মের আদর্শই তাঁর অন্বিষ্ট, সেই সুধীন্দ্রনাথের সিদ্ধিও সঙ্গীত রূপসৃষ্টিতে নয়। ম্যালার্মেকে অনুসরণ করে যিনি শব্দসচেতন হয়েছেন, তিনি ম্যালার্মের মতো সঙ্গীতাত্মক হননি।

> স্পৃষ্ট দৃষ্ট ত্রিভুবন ব্যাজজীবী কালের কমলে ;
> পলায়ন শশবৃত্তি ; লুপ্তি, গুপ্তি পরিহাস শ্লেষ ;
> সে-উন্নিদ্র ত্রিলোচনে ভেদ নেই ধবলে শবলে ;
> অনুজের গলগ্রহ অগ্রজের নিভৃত আশ্লেষ॥

এই পঙ্‌ক্তি কয়টিতে যে শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে তাকে ঠিক শ্রুতিসুখকর বলা চলে না। শব্দপ্রয়োগে সংস্কৃতনির্ভরতা আছে, ব্যাকরণ-লঙঘন নেই। বরং প্রচলিত কাব্যরীতির অনুসরণে অনুপ্রাসের প্রতি প্রচ্ছন্ন প্রবণতা আছে বিশেষত চতুর্থ পঙ্‌ক্তিটিতে মন দিলেই বোঝা যায়। পঙ্‌ক্তিশেষের একান্তর মিল আছে। সেটি বাদ দিলে অনুপ্রাস-জনিত মধুসূদনের স্টাইলের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে। মোহিতলালও মধুসূদনের ভাষায় সঙ্গীতগুণের কথা বারবার উল্লেখ করেছেন। সুধীন্দ্রনাথের কবিমন অন্য কবিমনের থেকে আলাদা। তিনি অনুভূতিপ্রবণ কবি ছিলেন না—ছিলেন বুদ্ধিপ্রবণ কবি। অনুভবকে তিনি বুদ্ধির আকার দিয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। আমি তো মনে করি, সুধীন্দ্রনাথের কবিতা কবিতার একটা নতুন চেহারা। কবিতা সম্বন্ধে আমাদের একালের সংস্কারকে তিনি বদলে দিয়েছেন। কবিতা ভাবের বিষয়, সুধীন্দ্রনাথের কবিতা এই সংজ্ঞার অধীন নয়। অভিনব গুপ্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কবিতার প্রকৃতি রসিকজনগ্রাহ্য ছিল। সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় তার অবসান ঘটাল। 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্' বা A thing of beauty is a joy for ever-এসব সংজ্ঞা এখন থেকে আর প্রযোজ্য হবে না। 'রস' বা 'সৌন্দর্য' বুদ্ধির ব্যাপার নয়, অনুভবের বস্তু। জীবনের প্রকৃতিকে সুধীন্দ্রনাথ বিশ্লেষণ করে রহস্যমুক্ত করে প্রকাশ করেছেন। প্রেমকে পরিহাস করেছেন, ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করেছেন, মুহূর্তের অভিজ্ঞতাকে স্বীকার করেছেন। জীবনকে রহস্যমুক্ত করে দেখতে চাইলে যে আবেগ থাকবে না, তা নয়, কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ সে আবেগ থেকে মুক্ত।

সুধীন্দ্রনাথের কবিমানস আমাদের আলোচ্য নয়। জীবনানন্দের কবিতায় শব্দের

ব্যবহারে কী বৈশিষ্ট্য সে-সম্পর্কে উল্লেখ করেছি। সুধীন্দ্রনাথের শব্দপ্রথানুগত্য-বিরোধী কিন্তু এ বিষয়ে জীবনানন্দের সঙ্গে তাঁর মিল নেই। জীবনানন্দ নতুন বা অপরিচিত শব্দ ব্যবহার তেমন করেননি। তবে চলতি শব্দের অন্বয়ে বা ব্যাকরণে নতুনত্ব করেছেন। তার ফলে তাঁর কবিতায় ভাবের একটা প্রত্যক্ষ সঞ্চালন ঘটে। সুধীন্দ্রনাথ অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করেছেন, তাতে ভাবের অনায়াস সঞ্চালন ঘটে না। শব্দ এবং তার অন্বয়ার্থ বোঝাবার জন্য কিঞ্চিৎ মানসিক শ্রমের দরকার। এই শ্রমের ফলে ভাবগত উপলব্ধি ঘটে না, চিন্তাগত উপলব্ধি ঘটতে পারে। চিন্তাগত উপলব্ধি দিয়ে কবিতা হয় না এ-তত্ত্বেরই বিরোধী সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। ম্যালার্মের প্রভাব সুধীন্দ্রনাথে একটি দিকেই কাজে লেগেছে—শব্দসন্ধানে, কিন্তু সে-শব্দ চিন্তাকে বাজিয়ে তোলবার জন্য, অনুভবকে সঞ্চারিত করবার জন্য নয়। তাই তাঁর কবিতার সাফল্য ম্যালার্মে-কথিত সঙ্গীত সৃষ্টিতে নয়—চিন্তাকে অবয়ব দেওয়ায়।

রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা কবিতা-শৈলীতে শব্দ-প্রয়োগের এই দুটি দিক। একটি জীবনানন্দীয় আদর্শ, অন্যটি সুধীন্দ্রীয় আদর্শ। সেকালের দিনে প্রথাগত সমালোচকরা এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেননি। দুইই তাঁদের কাছে এক গোত্রের। কিন্তু রবীন্দ্রপরবর্তী আধুনিক বাংলা কবিতাকে আর-একটু নির্দিষ্টভাবে দেখলে শব্দব্যবহারে দুটি রীতির পার্থক্য চোখে পড়বে। আধুনিকতা আলোচনার আরও অনেক দিক আছে। প্রতীক, চিত্রকল্প বা কবিতার বিষয় দিয়ে যেমন বাংলা কবিতার পালাবদল দেখানো যায়, তেমনি শব্দ প্রয়োগ দিয়েও দেখানো যায় কিন্তু তারও বিভিন্নতা আছে। এই বিভিন্নতা দিয়েই দুটি কাব্যস্টাইল তৈরি হয়েছে বলা কি অসঙ্গত হবে? এ দাবী অবশ্যই করা চলবে না যে, এদের মিশ্রণ কখনই হবে না এবং তারা কক্ষবিভক্ত।

বাংলা উপন্যাস : ঐতিহ্য ও রূপ

লিখতে বসে প্রথমেই যে প্রশ্নের দ্বারা বিদ্ধ হই সেটা এই যে বাংলা উপন্যাসের ঐতিহ্য কি? উপন্যাসের ঐতিহ্য কি জীবনের ঐতিহ্য থেকে আলাদা? আমরা যে সময়কার বিশ্বাস আকাঙক্ষা তৃপ্তি ও ব্যর্থতার দ্বারা নিয়ত আন্দোলিত, উপন্যাসের মধ্যেও কি সেই ভাব-দ্বন্দ্ব ও মূল্যবোধ পটভূমি রচনা করে না? এ প্রশ্ন বিশেষ করে আমাদের প্রাসঙ্গিক মনে হয় উপন্যাসের ক্ষেত্রেই। সমাজে যে বিশ্বাস এবং বোধের ধারা চলে এসেছে, স্বভাবতই উপন্যাসেও তার প্রতিফলন ঘটবে। সেই বিশ্বাস নিয়ে গড়ে উঠবে উপন্যাসের জগৎ। এ যুগে কেউ কি ভাবতে পারে এখনকার উপন্যাসেও আঁকা হবে সেই সব মানুষদের যারা সতীদাহ পালন করে, নারীচিত্তকে বন্দী ক'রে রাখে শাস্ত্রানুগত বিধি বিধানে—সেই সব মানুষ যারা কোনোদিন তীর্থক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোনো দেশের নাম শোনেনি।

অবশ্য একদিন এরকম সমাজ এবং এরকম মানুষও ছিল। সেই সমাজে মানসিক দ্বন্দ্ব এবং মূল্যবোধের প্রকৃতি ছিল অন্যরকম। যে জগতে তারা বাস করত, বিশ্বাসের যে ভূমিতে তারা বিচরণ করত, সেখানেও যে দ্বন্দ্ব ছিল সংঘাত ছিল তার উপকরণ ছিল একরকম। আজ বিশ্বাসের চেহারা পালটে গিয়েছে। মূল্যবোধ বদলে গিয়েছে। এখনও দ্বন্দ্ব আছে, হয়তো বেশিই আছে কিন্তু তার উপকরণ অন্যরকমের। সতীদাহের যুগে হয়তো শাস্ত্রনির্দিষ্ট অনিবার্য কর্তব্যবোধের সঙ্গে মানবচিত্তের সংঘাত বাধত। আজকের সংঘাত শাস্ত্রবচনকে অন্ধভাবে অনুসরণ করবার প্রয়োজন থেকে জাগে না। হয়তো জাগে রাজনৈতিক কোনো আদর্শে আত্মাহুতি দেবার প্রয়োজন থেকে। সংঘাতের প্রকৃতি আলাদা, তাতে মানব চরিত্রে বিকাশও ভিন্নতর এবং জটিল।

উপন্যাস বিশেষ ক'রেই তার যুগের ছায়াকে ধারণ করে। সাহিত্যের অন্য শ্রেণীর কথা যাই হোক উপন্যাসের প্রধানতম নিরিখ হচ্ছে তার বাস্তবতা। অনেক গদ্য-কাহিনী রোমান্স বলে আলাদা শ্রেণীতে বিভক্ত হয় যেহেতু তাতে বাস্তবতার চেয়ে কল্পনা জায়গা জোড়ে। রোমান্সে স্বভাবতই সমাজের সত্যকে অনুসন্ধান করার চেষ্টা অর্থহীন। তবে এটাও ঠিক রোমান্স পাঠকের রসপিপাসার চরিতার্থতা ঘটায়। সেজন্য সেও একটা শিল্প-কর্ম। এই শিল্প-কর্ম সৃষ্টি করার ব্যাকুলতা তৈরী করে একটা ঐতিহ্য। তাকে বলা যায় রোমান্স রচনার ঐতিহ্য। রবীন্দ্রনাথ যখন গল্পগুচ্ছের প্রেরণা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন, বঙ্কিম বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন রোমান্সের লেখায় ডুবে গিয়েছিলেন, কারণ তখন পাঠক তাই চাইত, তখন বোঝা যায় বাংলা সাহিত্যে রোমান্সের একটি ঐতিহ্য তৈরী হয়েছিল। সুতরাং ঐতিহ্য বলতে দু'রকমের ঐতিহ্যকে বোঝাতে পারে—একটা সাহিত্যের ঐতিহ্য, আর একটা জীবনের ঐতিহ্য যার থেকে সাহিত্য রচিত হয়।

সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস এই দুই ঐতিহ্যকে কতটা রক্ষা করেছে, কতটাই বা তাদের থেকে সরে এসেছে? উপন্যাস বলতে যে বিশেষ সাহিত্যশ্রেণী বোঝায় উনিশ শতক থেকেই সেটা চলে এসেছে। উপন্যাসের আকৃতি অবশ্যই অনড় হয়ে নেই। বঙ্কিম উপন্যাসের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন বিদেশী সাহিত্য থেকে। উপন্যাসের সেই আকৃতির বদল ঘটেছে। শরৎচন্দ্র পর্যন্ত বলা যায় বঙ্কিমী উপন্যাসের রীতি চলে এসেছে। একথা সত্য যে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে বিশ্লেষণ আছে, আবেগ আছে। তথাপি বঙ্কিমী উপন্যাসের যে প্রধান বৈশিষ্ট্য ঘটনার ধারাবাহিঁকতা রক্ষা করে কেন্দ্রীয় চরিত্রটিকে একটি পরিণামে নিয়ে যাওয়া শরৎচন্দ্রের উপন্যাসেও সেটা লক্ষ্য করা যায়। আবার শরৎচন্দ্রের উপন্যাসেই এমন একটা পরিবর্তনের সম্মুখীন হওয়া যায় যা' বঙ্কিমের উপন্যাসের বিপরীত। শ্রীকান্ত প্রথম পর্বের প্লট বঙ্কিমী উপন্যাসের প্লটের মতো নয়—যেন কয়েকটি গল্প একজনের চেতনায় আকার নিচ্ছে। কাহিনীর রস-ই উপন্যাস গল্পের রস। সেই কাহিনীকে ঘটনাক্রমে কার্য-কারণ যোগে সাজিয়ে তোলার—এই ঐতিহ্য থেকে সরে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ চতুরঙ্গে।

আস্তে আস্তে বঙ্কিমী আর্টের পরিবর্তন হল। মানুষের মনে কতরকমের চিন্তা ও অনুভূতির তরঙ্গ ওঠে, তার বিশ্লেষণে উপন্যাসের রস জমে উঠল। ঘটনা সামান্য হোক কিন্তু মনের তুচ্ছ ভাবনাটি সামান্য নয়। কারণ সেই ভাবনা বাইরের আচরণে যে কোনো সময়েই বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। সামান্য ভুল বোঝাবুঝি থেকে সুদুর পরিণামের সুচনা হতে পারে। এই সামান্যকে অসামান্য করে তুলতে শুধু শরৎচন্দ্র নয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও দেখেছি। আর্টিস্টের সবটা ঝোঁক গিয়ে পড়ছে চরিত্রের উপর ঘটনাকে ছেড়ে। আবার এটাও ঠিক, কোনো ঐতিহ্যই একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যায় না। বঙ্কিমের নাটকীয়তাও একেবারে চলে যায়নি। গল্পের একটা আকর্ষণ থাকেই।

কিন্তু এ-সবই বাইরের ফরম্। উপন্যাসের এই ফরম নেহাৎই বাহ্যিক। আসলে উপন্যাসের সে রকম কড়াকড়ি কোনো ফরম-ই নেই। এখন বোঝা যায় ঘটনার ধারাবাহিকতা কিংবা কার্য-কারণ না থাকলেও উপন্যাস হতে পারে যদি লেখক তার 'inner form' টি তৈরী করে নেন। জীবনকে লেখক একটি প্যাটার্নে দেখে থাকেন, সে প্যাটার্ন সর্বজনগ্রাহ্য বা বস্তুনিষ্ঠ হোক বা না হোক। একমাত্র যার মন নিয়ন্ত্রিত নয়, অপ্রকৃতিস্থ, সে জীবনের কোনো প্যাটার্ন দেখতে পায় না। সব কিছু তার কাছে অসংলগ্ন, বিশৃঙ্খল ভাঙাচোরা মনে হয়। কোনো একজনের দৃষ্টি আর একজনের সঙ্গে মেলে না, এটা সত্য। তবু যারা শিল্পী তাঁরা জীবনের একটা শিল্পিত রূপ কল্পনা করেন। বাইরের জগতে, মানুষের সমাজে যে নিয়মশৃঙ্খলা দেখা যায়, সেই শৃঙ্খলাতে তাঁরা সন্তুষ্ট থাকেন না। কারণ এর মধ্যে কোনো বিস্ময় নেই, আছে অভ্যাস মাত্র। লুকাচ লেখকের এই কল্পিত প্যাটার্নকে বলেছেন immanence। লেখক যে উপন্যাস লেখেন, তার জগতে এই প্যাটার্নই দেখি।

লেখক দেখেন একটা প্যাটার্ন। সেই প্যাটার্নে তিনি ঘটনাগুলি সাজান, তার থেকে ফলশ্রুতি রচনা করেন।

উপন্যাসের এই লেখকমনের রচিত প্যাটার্ন বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের অবশ্যই ছিল। এর একটা নাম সমালোচনাসূত্রে আছে দৃষ্টি-ভঙ্গি বা দৃষ্টিকোণ—Point of view, কথাটা দ্ব্যর্থক। একটা নৈতিক, আর একটা প্রকৃতি-গত। কোনো ঘটনাকে লেখক বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে বিশেষ রূপ দিতে পারেন, তাকে বলতে পারি নৈতিক। আবার কোনো স্পষ্ট উদ্দেশ্য না থাকলেও কাহিনী একটা বিশেষ রূপ নিয়ে ফুটে উঠতে পারে, তাকে বলা যায় প্রকৃতিগত। বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ পর্যন্ত মোটামুটিভাবে বাংলা উপন্যাসের কাহিনী ছিল নৈতিক। ঘটনাগুলি তাঁরা নিজের দৃষ্টিকোণ থেকেই সাজিয়েছেন, তাতে moral হোক aesthetic হোক একটা উদ্দেশ্য থাকে। শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজে রমা রমেশের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে, আবার তারকেশ্বরে রমেশকে খাইয়ে তৃপ্তি পেয়েছে, রমেশ নিজেও তৃপ্ত—এই ঘটনা দুটো লেখকের অন্তরের একটা সৌষম্য থেকেই সজ্জিত। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইলে প্রসাদপুরের কুঠিতে নিশাকরের আবির্ভাবও লেখকের কল্পিত কার্য-কারণে সাজানো শৃঙ্খলার যোগে।

অতএব এই অন্তরীণ শৃঙ্খলাবোধের কোনো নির্দ্দিষ্ট রূপ নেই। যে লেখক যেমন করে জীবনকে দেখেন, তিনি তেমনি করেই উপন্যাসে তার ফরম দিয়ে থাকেন। প্রাচীন সাহিত্যশাস্ত্রে চরিত্র ঘটনা প্রভৃতির সংজ্ঞা দেওয়া থাকে। সে সংজ্ঞা খুবই সাধারণ (general)। চরিত্র বা ঘটনা বাইরের জীবনের স্থূল বাস্তবতার বিরোধী হবে না—এইটুকু মাত্র বলা যায় কিন্তু কোন সম্পর্কে বা কিসের যুক্তিতে তারা সম্বদ্ধ হবে, সেটা লেখকের নিজস্ব ফরমের উপরেই নির্ভর করবে। বাইরের জগতের বাস্তবতার সঙ্গে অন্তর্লীন ফরমের যোগ আছে অবশ্যই। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের বাস্তবতার উপর ভিত্তি করেই ঘটনাগতির ফরম দিয়েছেন। রাজসিংহের জেবউন্নিসা ইতিহাস থেকে প্রাপ্ত কিন্তু রাজকন্যার সঙ্গে একজন সুবেদারের প্রণয় এবং তার ব্যর্থ পরিণামে জীবনের যে ছবিটি ফুটে উঠেছে, সেটা বঙ্কিমচন্দ্রের দেওয়া ফরম। এই পরিণামের মধ্যে দিয়েই বঙ্কিম তাঁর বিশ্বাসটিকে ধ্বনিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গোরা সেকালের প্রচলিত সংস্কার ও বিশ্বাসের বাস্তবতা দিয়ে গড়ে ওঠা চরিত্র। সেই চরিত্র যে নানা কল্পিত ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে সার্বিক জীবন চেতনায় পৌঁছল—সেটা স্থূল বাস্তবতা না হতে পারে, কিন্তু লেখকের বাস্তবান্তর্লীন জীবনসত্যের-ই রূপ।

যে সমাজ-বাস্তবকে আশ্রয় করে বাংলা উপন্যাস রচিত হ'য়ে এসেছে, ইতিহাসের বিধানে তার নানা পালা-পরিবর্তন হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত প্রায় ষাট বৎসরে বাংলা উপন্যাসের প্রকৃতিতে পরিবর্তন এলেও ঐতিহ্য খুব একটা বদলায়নি। লেখকের দৃষ্টি বহির্জীবন থেকে ক্রমেই অন্তর্জীবনে প্রসারিত হয়েছে—উপন্যাসে মনোবিশ্লেষণের ক্রম-প্রাধান্যে-ই তার প্রমাণ। কিন্তু যে বিশ্বাস

তাঁদের জীবনচেতনার গ্রন্থি রচনা করেছে, সে বিশ্বাস অটল ছিল কতকগুলি মূল্যবোধে। প্রেম, মানবিকতাবোধ, পারিবারিক সম্পর্ক, ধর্ম-চেতনা এইসব মূল্যবোধ মূলত অপরিবর্তিতই ছিল। গোবিন্দলাল-ভ্রমরের দাম্পত্য প্রেম ভেঙে গেল রোহিণী নামক তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে, সেটা ট্রাজেডি রূপে বাংলা সাহিত্যে অবিস্মরণীয় হয়ে রইল। কিন্তু ট্র্যাজেডি সে হল এই কারণেই যে দাম্পত্য প্রেম বস্তুটা বদলে যায়না। বিনোদিনীর প্রেমবাসনা যেমন সত্য, তেমনি সত্য তার নারীহৃদয়ের অচরিতার্থতা। বিনোদিনী পাঠকের সহানুভূমি আকর্ষণ করে তার নারী-হৃদয়ের অচরিতার্থ বেদনা দিয়ে। শরৎসাহিত্যে প্রেমের ত্যাগ ও আত্মদহন যেমন, বঙ্কিম-সাহিত্যে কুন্দের কিংবা প্রতাপের প্রেমের ত্যাগ ও আত্মদানও সেইরকম। জীবন-বাস্তবতার একটা পূর্ণায়ত রূপ থেকেই এই সব মূল্যবোধের সৃষ্টি। পারিবারিক বন্ধন অটুট ছিল রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগে', স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কে যতই চিড় ধরুক সেই সম্পর্কের ভিত্তিতেই উপন্যাসের কাহিনী। 'ঘরে বাইরে'ও তাই। নিখিলেশ নতুন যুগের মানুষ, নারী-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। কিন্তু নিখিলেশ এবং বিমলার দাম্পত্য-বন্ধনের মূল্যকে মেনে নিয়েই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কল্পনা। ব্যক্তি এবং সমাজের দ্বন্দ্বে নতুন যুগের ইশারা পাওয়া যায়। কিন্তু সমাজের মূল্য তখনও যায়নি।

হিন্দু-সমাজের এই স্বতঃসিদ্ধ বাস্তবতা আমাদের উপন্যাস-সাহিত্যের ভিত্তি। বঙ্কিম যে দৃষ্টিতে সমাজকে দেখতেন, শরৎচন্দ্র সেই দৃষ্টিতেই দেখেছেন, অবশ্যই তা' নয়। কিন্তু ব্যক্তির স্থান যে সমাজ নিয়ে, এ সত্যটি কখনও অস্বীকৃত হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত সমাজাশ্রিত ব্যক্তির জীবনই উপন্যাসের কাহিনী। তারাশংকরের উপন্যাসেও সামাজিক মূল্যবোধকে অটুটই দেখতে পাচ্ছি। সমাজের চেহারা পালটাচ্ছে সন্দেহ নেই কিন্তু গোষ্ঠীসম্পৃক্ত না হলে ব্যক্তির চলে না, এই বাস্তবতা এত দিন অস্বীকৃত হয়নি। গ্রামীণ সমাজ থাকছে না সত্য, কৃষিজীবন যন্ত্রসভ্যতার টানে ভাঙতে চলেছে, তারাশংকর এই পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করেছেন উপন্যাসে। কিন্তু ব্যক্তিকে নিয়ে এসেছেন নতুন সমাজবন্ধনের মধ্যে। ধাত্রীদেবতায় দেশ-চেতনা এই নতুন সমাজের প্রতীক। পথের পাঁচালীতে গ্রামের সমাজে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। অপু গ্রাম থেকে চলে এসেছে শহরে সমাজে। সেখানে নতুন এক বড় সমাজের আশ্রয় সে পেয়েছে। এই সমাজকে গড়তে শুধু যে অর্থনৈতিক সম্পর্কটার-ই প্রয়োজন তা নয়, হৃদয়ের সম্পর্কও কোনো অংশেই কম নয়। মানুষে-মানুষে প্রেম-প্রীতির মূল্য তখনও অম্লান। জীবনে যখন সমস্যা অসাধ্য এবং আয়ত্তাতীত হয় না, তখন জীবন সম্পর্কে ধারণা হয় এক রকম। জীবনে যখন সমস্যা অসাধ্য হয়ে ওঠে, কিছুতেই তাকে মেলানো যায় না, তখন তাকে মনে হয় অন্যরকম। এক সময়ে মনে হয় God is in His Heaven and all's right with the world. আর এক সময় সংশয় জাগে ভগবান বলে কেউ কি এমন আছেন যিনি শৃঙ্খলাবিধায়ক?

আমরা বলি বটে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সমাজে পরিবর্তন এসেছে, তাই সাহিত্যেরও রূপ বদলেছে। কিন্তু একটু ভাবলে বোঝা যাবে, সমাজে মূলগত পরিবর্তন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আসেনি, এসেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। আমাদের একান্নবর্তী পরিবার বিশ শতকের দ্বিতীয় তৃতীয় দশকেও ছিল। চাকরি ও শহুরে জীবনের বিস্তারের সঙ্গে পরিবার থেকে ব্যক্তিকে বাহিরে চলে যেতে হলেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত একান্নবর্তিতার চরিত্রটুকু বজায় ছিল। চতুর্থ দশক থেকেই একান্নবর্তী পরিবার ভাঙতে শুরু করে। কিন্তু তারও পরে থেকে যায় পিতামাতা ভাইবোনকে নিয়ে একান্নবর্তিতার বাঙালি সংসার। কল্লোলের লেখকরা উপন্যাসে বাস্তবতা নিয়ে এসেছেন সত্য, কিন্তু সমাজের গড়নে সে রকম বিপর্যয় বড়ো হয়ে ওঠেনি বলে সাহিত্যে পূর্বতন ঐতিহ্যের সে রকম আমূল পরিবর্তন আসেনি। শরৎচন্দ্রের প্রভাব ছিল অক্ষুণ্ণ। উপন্যাসের রীতি পদ্ধতিও ছিল পূর্বাগত। বিদেশী সাহিত্যের প্রভাবে তাঁরা যতখানি অভিনব হয়েছেন, সমাজের স্বাভাবিক প্রবণতায় ততটা নয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং তারপর দেশবিভাগের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে আমাদের সাহিত্যে পড়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আমাদের সাধারণ জনজীবনকে তেমন স্পর্শ করেনি। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে দুর্ভিক্ষ দারিদ্র্য অতি প্রকট হল। এই সময়ের অগাস্ট আন্দোলনও আমাদের লেখক, শিল্পীদের কম প্রভাবিত করেনি। যুদ্ধের প্রভাব দেখা গেছে জিনিসপত্রের দুর্মূল্যতায়, অর্থোপার্জনের জন্য নীতিহীন উপায় অবলম্বনে। এই প্রয়োজনের কাছে ভেসে গেল মানুষের নীতিবোধ—আমাদের এতদিনকার সংস্কার। গান্ধীজির আন্দোলনেও সে নীতিবোধের পুনরুদ্ধার হল না। এ এক অদ্ভুত সময়। একদিকে জৈব জীবনের তাড়না, আর একদিকে স্বদেশের স্বাধীনতা লাভের আদর্শ। একটা যদি ভাঙলে, অন্যটা ঠিক ততখানি গড়ে তুলতে পারল না। কেননা, অগাস্ট আন্দোলনের মধ্যেও ভাঙার একটা প্রেরণা ছিল।

আমাদের মূল্যবোধ যে কী রকম সঙ্কটের মধ্যে এসে পড়েছে তার দৃষ্টান্ত সতীনাথ ভাদুড়ীর জাগরীর কাহিনী। রাজনৈতিক শক্তি এখন এত বড় শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে যে পারিবারিক জীবনেও আঘাত এসে পড়েছে। পরিবারই এতকাল ছিল আমাদের মূল্যবোধের আশ্রয়, ঐতিহ্যের স্রষ্টা। কে ন্যায় আচরণ করল, কে অন্যায় করল—এখন আর তার সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। যে নিজের ভাইকে পুলিশের হাতে তুলে দিল, সেও একটা রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী। সে মতটা যে মিথ্যা, এমন দ্বিধাহীন সিদ্ধান্ত করবার দিন আর নেই। রাজনীতি আগেও ছিল, সেই সব পুথিগত অ্যাকাডেমিক রাজনীতি এখন নতুন পরীক্ষার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। চল্লিশের দশক থেকেই নানা রাজনৈতিক দলের প্রত্যক্ষ অভ্যুত্থান শুরু হল। একদিন ছিল কংগ্রেস। কংগ্রেসের অহিংসা আন্দোলন এবং সন্ত্রাসবাদীদের আন্দোলনের পথ আলাদা হলেও মূল্যবোধে পার্থক্য ছিল না। দেশ জাতি অতীত

গৌরব, ধর্ম-সংস্কৃতি, পরিবার, মানবতাবোধের মূল আদর্শে কোনো বিরোধ ছিল না। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' এবং তারাশংকরের 'ধাত্রী দেবতা' মূল্যবোধের দিক থেকে স্বতন্ত্র নয়। কিন্তু চল্লিশের দশক থেকেই সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির প্রসার নতুন মূল্যবোধের সৃষ্টি করল—নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টির ইঙ্গিত নিয়ে এল। পরবর্তী দুই দশকের মধ্যেই রাজনৈতিক চেতনার উগ্রতা ছড়িয়ে গিয়ে নতুন নতুন রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি করল। দেশ-চেতনার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এল আন্তর্জাতিক চেতনা। রাষ্ট্রনীতিতে জাতি-চেতনাসর্বস্বতার নাম হল ফ্যাসিজ্‌ম আর আন্তর্জাতিকতার নাম হল সমাজতান্ত্রিকতা—সোস্যালিজম্। ফ্যাসিজ্‌মের অতীত গৌরববোধ ধিক্‌কৃত হল, জাতিহীন শ্রমজীবী মানুষের স্বাধিকার চেতনা বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রবলতা লাভ করল।

পুরনো ঐতিহ্যকে ভাঙতে দেশ বিভাগও কম সাহায্য করেনি। আমরা দেশকে যে মূর্তিতে ভেবে এসেছি, সে মূর্তিকে যদি ভেঙে ফেলাই সম্ভব হয়, তবে আমাদের প্রচলিত নৈতিকতার স্বয়ংসর্বস্বতা সম্বন্ধে আপনিই সংশয় দেখা দেবে। যাকে 'অ্যাবসোলিউট' বলে ভাবতে অভ্যস্ত ছিলাম, দেখা গেল সে তা নয়, তাকেও বদলে যেতে হয়। বিশ্বাসের ভাঙনের এটা একটা দৃষ্টান্ত। এই ভাঙনের ফলে পুরনো পৃথিবী তার মূল্যবোধ নিয়ে দূরান্তরিত হয়ে গেল। চোখের উপর যে বাস্তুহারা মানুষগুলিকে দেখা গেল, তারা কোন বিশ্বাস নিয়ে কোন ঐতিহ্যকে সহায় ক'রে বেঁচে থাকবে? জীবন-সংগ্রাম হয়তো কোনো কালেই সহজ ছিল না, কিন্তু সেই সংগ্রামে চিরকালই একটা অবলম্বন ছিল। সেই অবলম্বনটাও যেন হারিয়ে গেল। মানুষকে বাঁচতে হবে, বাঁচবার জন্য যে কোনো অবলম্বন, যে কোনো উপায়কেই নিতে হবে। তার ফলে প্রতারণায় লজ্জা নেই, অসাধুতায় বিবেকদংশন নেই। পঞ্চাশের পর বাংলা উপন্যাসের রীতিনীতি বদলে গেল। পুরনো মূল্যবোধ গেল, নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি হল কি?

'পূর্বের সমাজে গুরুবাদ ছিল, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রার নিশ্চয়তাও ছিল। আজ ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত এবং বহু ক্ষেত্রে লক্ষ্যহীন। পুরনো সমাজ-বন্ধনের মধ্যে ফিরে যাওয়ারও কোনো সম্ভাবনা নেই। আজকের দিনে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বন্ধনে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সমাজ যেভাবে পরস্পরের সঙ্গে গাঁথা, তাতে আজ কোন দেশ অথবা সমাজের পক্ষে বাইরের পৃথিবীকে অগ্রাহ্য বা অস্বীকার করবার পথ নেই। যে সব মানুষের সঙ্গে জীবনে কোনদিন দেখা হবে না, যাদের অস্তিত্বের কথাও আমরা সাধারণত ভাবি না, তারা আজ আমাদের ব্যক্তিগত জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। আমাদের অজান্তে যে সব সিদ্ধান্ত, আমাদের জীবন-মরণও তাদের উপর নির্ভরশীল। অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় শক্তির ক্রীড়নক হিসাবে ব্যক্তিবোধ এর পূর্বে কোনদিন এত নিরুপায় বোধ করে নি। একদিকে বিপুল বিশ্বের ভার এবং অন্য দিকে ব্যক্তিবিশেষের অসহায়তা।'

—হুমায়ুন কবির, 'ভারতীয় ঐতিহ্য', চতুরঙ্গ, ৩১ বর্ষ ২ সংখ্যা।

এভাবে যখন প্রতিষ্ঠিত সমাজের শৃঙ্খলা ভেঙে গেল, তখন যে বন্ধন দিয়ে সমাজ ব্যক্তিকে রক্ষা করে, তাও গেল শিথিল হয়ে। ব্যক্তি চরিত্র নিয়ে উপন্যাস-রচনার পালা এসেছিল, এবার সেটাও গেল। কোনো সমালোচক বলেছেন, বাংলা উপন্যাসে প্রথমে ছিল প্লটের প্রাধান্য, তারপর হল চরিত্রের প্রাধান্য, এবার হল লেখকের প্রাধান্য। সত্যই সমাজের এই বিশৃঙ্খলতায় ব্যক্তিচরিত্র গড়ে ওঠা যেন স্বাভাবিক নয়। চরিত্রকে এখন নানা অবস্থার দাসত্ব করতে হচ্ছে। অবস্থা গড়ে তুলছে টাইপ, ব্যক্তি হচ্ছে গৌণ। সেই সঙ্গে লেখকের ইম্‌প্রেশন বা ধারণা উপন্যাসের কাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করছে। লেখক কখনও তৈরী করে তুলছেন সামাজিক পরিমণ্ডল, চরিত্র হচ্ছে তারই প্রতিনিধিস্থানীয়, কখনও সমাজের এই বিশৃঙ্খলার একটা ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করছেন, কখনও কিছুই করছেন না, শুধু বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত কতকগুলি স্কেচ্ দিচ্ছেন মাত্র। এই কারণেই লেখক হ'য়ে উঠছেন প্রধান। উপন্যাসের ফর্ম বদলে যায়, কারণ যে সমাজজীবনকে নিয়ে উপন্যাস, সেই সমাজের গড়ন বদলে গেছে। আগের একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে গিয়ে স্বামী-স্ত্রী মিলে ছোট ছোট ইউনিট তৈরী হচ্ছে। আগের বড় বড় বাড়ি ভেঙে ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরী হচ্ছে; এই সব ছোট ছোট ইউনিটের জন্য। মানুষ হয়েছে আত্মকেন্দ্রিক যদিও খবর রাখে বিশ্বের। বিশ্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হচ্ছে শিক্ষায় বৃত্তিতে। কিন্তু এই প্রতিযোগিতা আজকের জগতে স্বাভাবিক হ'লেও সুস্থ নয়। কারণ এর সঙ্গে কোনো নৈতিক বোধ জড়িত নেই। যেমন করে হোক পরীক্ষায় পাশ করা দরকার, যেমন করে হোক চাকরি পাওয়া দরকার। সেজন্য অসাধুতা আইনত দণ্ডনীয় হলেও আজকের কমন সেন্সে নিন্দনীয় নয়। নৈতিক বুদ্ধির ক্রম অবমূল্যায়নের ফলে আমাদের জীবনের চেহারা অনেকটা বদলে যাচ্ছে।

কেন এরকম হচ্ছে তার নানা ঐতিহাসিক কারণ থাকতে পারে। সেই কারণ এখানে আলোচ্য নয়। কিন্তু এই ভগ্ন বিক্ষিপ্ত নীতিহীন জীবনের ছায়া যে উপন্যাসে পড়বে সেটাই স্বাভাবিক। দেশভাগের ফলে যে মানুষগুলি এ দেশে এল, বাঁচবার প্রয়োজনে তাদের অনেক আদর্শ অনেক নীতিকেই বিসর্জন দিতে হয়েছে। নীতিহীনতা একবার শুরু হলে তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা দেওয়া শক্ত। ধর্ম দিয়ে নীতিকে রক্ষা করার ঐতিহ্য ছিল সমাজে, কিন্তু সে সমাজ নেই, ধর্মের অনুশাসনও অনাদৃত।

আমাদের পুরনো ঐতিহ্যকে হারিয়েছি। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী যে আদর্শের কথা বলেছেন, বিবেকানন্দ যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছেন, বিশ শতকের উত্তরভাগে সে থাকল পুথিবদ্ধ হয়ে। দেশভাগের পর কোনো গঠনমূলক মূল্যবোধ গড়ে উঠল না। সমাজের এই বিপর্যস্ত অবস্থায় বাংলা উপন্যাস ভরে উঠল মরবিড ভাবনায়, ক্লান্তি ও নৈরাশ্যে। এবং একে প্রকাশ করে বলবার জন্য উপন্যাসের ফর্মের পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাবোধ। সেই সময় থেকেই বাংলা উপন্যাসের গতি দ্বিমুখী। বাঙালী বুদ্ধিজীবী লেখক—যাঁরা বিশ্ব-সাহিত্যের খোঁজ-খবর রাখেন, যাঁরা

সমাজের এই রূপটিকে দেখেন দূরের থেকে, তাঁরা উপন্যাসে শূন্যতাকে ফুটিয়ে তুলতে চান নিঃসঙ্গ নায়ক চরিত্র সৃষ্টি করে কামু বা কাফ্‌কার অনুকরণে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যার সুর' (১৯৬৬) উপন্যাসের নায়ক বলে—

'আমি কাউকে খুন করতে চাইনি। বিশ্বাস করুন আত্মহত্যাই করতে চেয়েছিলুম। কিন্তু একথা কি স্বীকার করেন যে জীবনে কখনো কখনো খুন আর আত্মহত্যা এক হয়ে যায়। দু'টোকে আলাদা করা যায় না।'

চরিত্রের এই যন্ত্রণা-বিদ্ধ রূপ আমরা আরও অনেকের লেখাতেই পাই। জীবনের সঙ্গে উপন্যাসের নায়কের সাম্য ঘটল না, তাই তার আত্মদহন ও যন্ত্রণা। তার কাছে হত্যা আর আত্মহত্যা এক, কারণ কোনোটারই কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এই শূন্যতাবোধ থেকেই চলে জৈবজীবনের ক্রিয়াগুলি যন্ত্রের মতোই। এসবের বর্ণনাতেও সঙ্কোচ নেই, লজ্জা নেই। আধুনিক আমেরিকান উপন্যাসগুলিতে এ সবের বর্ণনা নিরঙ্কুশ। তার প্রভাব আমাদের লেখকদের উপর পড়তে পারে। সেই সঙ্গে একটা ভাবনাও জেগে ওঠে, যে কারণে বিদেশী উপন্যাসে জীবনযাত্রার নিরঙ্কুশ নীতিবোধ লুপ্ত সেই কারণ তো আমাদের উপন্যাসে নেই। তবে কেন পরিণাম একই? ওদের সমাজের সমৃদ্ধি অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্য শেষ পর্যন্ত জীবনটাকে কেবলই ভোগ্যবস্তুতে পরিণত করেছে, তারই ফল হয়েছে ক্লান্তিতে বিষাদে অতৃপ্তিতে। আমাদের সমাজে ধন নেই, আশ্রয় নেই বলেই নৈরাশ্য। বাঙালি বুদ্ধিজীবী ঔপন্যাসিকেরা উপন্যাসের রীতিনীতি নিয়ে নতুনভাবে পরীক্ষা করার প্রয়োজনবোধ করছেন বলেই তারা যেন কামু বা কাফকার অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কামুর পথে তাঁদের উপন্যাসের রীতি ছিল তাদের সত্তাবাদী জীবনদর্শনের সাহিত্যিক রূপদান। এই সত্তাবাদী জীবনদর্শন কি আমাদের আক্রান্ত করেছে? এ যেন আমাদের কাছে এখনও মনে হয় বুদ্ধি বিলাস। আমাদের সমাজের এখনও অনেক কিছু করণীয় আছে, এখনও তাকে লক্ষ্যলাভে অগ্রসর হতে হবে। সব কিছু পাওয়ার পর যে ক্লান্তি ও অবসাদ— আমাদের জীবনে সেটা এখনও অবাস্তব।

আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যে স্বীকারোক্তিমূলক উপন্যাসের একটি শ্রেণী গড়ে উঠেছে। রীতি হিসাবে এটা যে একেবারে নতুন তা নয়। কিন্তু আধুনিক উপন্যাসের নায়কের অনুতাপ পাপবোধ দিয়ে যে যন্ত্রণাবিদ্ধ রূপটি ফুটে উঠেছে, তার সঙ্গে সমকালীন সমাজজীবনের যোগটা ঘনিষ্ঠ—এরকম যোগ আগে ছিল না। বাঙালি ঔপন্যাসিকেরা আধুনিক রীতিকেই নিয়ে এসেছেন। বঙ্কিমের 'রজনী' ব্রন্টির উদারিং হাইট্‌স-এর রীতিতে নয়। বিমল কর, সমরেশ বসু, সন্তোষকুমার ঘোষের উপন্যাসে এই রীতির প্রয়োগ আছে। নায়ক নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে, পৃথিবীর সঙ্গে তার কোনো বন্ধন নেই, কোনো কিছুর অর্থ খুঁজে পাচ্ছে না, এই শ্রেণীর বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ নায়কের দেখা আজকালকার বুদ্ধিজীবী লেখকদের উপন্যাসে প্রায়শঃই পাওয়া যাবে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নায়ককেও দেখি পারিপার্শ্বিক থেকে বিচ্ছিন্ন,

কারো প্রতি নৈতিক আকর্ষণ বা দায়িত্ববোধ তার নেই। যা সে করে, যা সে ভাবে সবই যেন তা দেহের স্বাভাবিক নিয়মে করে। সমরেশ বসুর বিবরের নায়ক যান্ত্রিক নিয়মে 'বিধাতার দেনা' শোধ করে, প্রেমিকাকে হত্যা করে, বাবাকে অভব্য ভাষায় স্মরণ করে।

সমরেশ বসু এক সময়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামী হয়েই লেখক জীবনের আরম্ভ করেছিলেন। আমাদের উপন্যাসের রিয়ালিজমের গুরু বলেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণীয়। তিনি যখন ফ্রয়েডীয় তত্ত্বকে বাস্তব সত্যরূপে উপন্যাসে প্রয়োগ করলেন, তখনই আত্মানুসন্ধানের পথ খুলে গিয়েছিল —The discovery that man's action could be 'motivated' by forces of which he might know nothing introduced a probable irrationality into human behaviour which was profoundly disturbing. (*The Modern Age, Penguin 1961, p. 19)*। সমরেশ বসু নায়কের অবচেতন মনের অতলে প্রবেশ করেছেন এবং নায়কের আচরণকে একটা বিশৃঙ্খল যুক্তিহীন পারিপার্শ্বিক সমাজের পটভূমিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। মানিক ব্যক্তির অন্তর-চিত্রটি ফোটাতে ব্যাপৃত, সমরেশ সমাজের নীতিহীনতাকে ফোটাতে ব্যাপৃত। 'ব্যক্তি যে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, এটাই এই লেখকদের অভিপ্রেত বক্তব্য। একই দৃষ্টিভঙ্গীর সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে বিমল করের 'যদুবংশে', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আত্মপ্রকাশে',—মূলকথা স্বীকারোক্তি,—হারানো সরলতাকে ফিরে পাবার জন্য প্রয়াস ও হাহাকার। নানা টুকরো ঘটনার বিচ্ছিন্ন স্রোতের মধ্য দিয়ে উপন্যাস এগিয়ে চলে—আখ্যান নয়, প্রসঙ্গের প্রাধান্য; সব কিছুকে টেনে চলেছে নায়ক। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের একটি ছেলে কিভাবে নির্মম হৃদয়হীন সংসারের সঙ্গে সংগ্রামে নিয়ত ক্ষত বিক্ষত হচ্ছে তার ছবি 'আত্ম-প্রকাশ'। সূক্ষ্ম অনুভূতি, সততা, সৌন্দর্যব্যাকুলতা কী ভাবে সমাজে দলিত পিষ্ট হয়, তা সুনীল দেখিয়েছেন।'

কিন্তু একথাও সম্পূর্ণ সত্য নয় যে, সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস পুরণো ঐতিহ্য সবই হারিয়েছে, এবং নতুন ঐতিহ্য গ'ড়ে তুলতে পারেনি। মানুষের বাঁচার তাগিদ আছেই, বাঁচতে গেলে পথ খুঁজতে হবে। সমাজে পথের নির্দেশ নানাজনে নানাভাবে দিচ্ছে। আজকের তরুণরা যারা ইস্কুল-কলেজে লেখা-পড়া করে বেরিয়ে আসে, তারা দেশে বিদেশে চাকরিবাকরি করে নানা ব্যবসায়িক উদ্যমে যুক্ত হয়। বেকার বসে থাকে এমনও অনেক আছে। বেকারের সংখ্যা বেড়ে যাওয়াতে জীবিকার জন্য অনেকে নানা অসাধু উপায় অবলম্বন করতে বাধ্য হচ্ছে একথা সত্য। আবার দেশ জাতিকে নতুন করে গড়বার বিষয়টি রাজনৈতিক দলেরও লক্ষ্য। এইসব তরুণদের অথবা বেকারদের এই রাজনৈতিক দলই কাজে লাগায়। দেশে রাজনৈতিক ঘনঘটা বাড়ছে, সব দলই দাবী করে তাদের আদর্শেই দেশে আসবে সুখস্বাচ্ছন্দ্য। আজকের সমাজে রাজনৈতিক সংঘর্ষ দিয়ে তরুণ-চিত্ত মথিত হচ্ছে। এই নিয়েও উপন্যাস লেখা চলেছে। এসব উপন্যাসেও জিজ্ঞাসা আছে। তার সঙ্গে আছে উন্মুখ আগ্রহ

একটা কিছু পাওয়ার। জীবনটাকে এরা অর্থহীন ভাবে না। তবে এইসব উপন্যাস পুরণো নীতিবোধকে ভেঙে নতুন নীতি গড়ে তুলতে চাইছে। এই নীতিবোধের কাছে হত্যা আর তেমন গুরুতর পাপ বলে গণ্য নয়। বিমল করের 'যদুবংশ' সমরেশ মজুমদারের 'কালবেলা' ও 'উত্তরকাল' প্রমত্ত যৌবনের পথ খোঁজার উপন্যাস।

প্রশ্ন জেগেই থাকে, আমরা এতকাল যা নিয়ে বেঁচেছি, প্রেম, দেশাত্মবোধ, ঈশ্বর, মানবতা—সে-সব কি জীবন থেকে হারিয়েই গেল? দেশ যখন পরাধীন ছিল, তখন বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ যে-আদর্শ দিয়ে তরুণচিত্তকে উদবোধিত করেছিলেন, দেশ-বিভাগ পর্যন্তও গান্ধীজি যে নীতিবোধকে শক্তি হিসাবে ব্যবহার করে বাঁচার একটা প্রেরণা দিয়েছিলেন—সেই ঐতিহ্য কি জীবন থেকে চলেই গেল? টলস্টয় যে মূল্যমান নিয়ে মহৎ উপন্যাস লিখেছিলেন, সে কি চিরকালের নয়? আজকের রাজনৈতিক নেতারা আমাদের তরুণদের কাছে কোন মহৎ মানবিক মূল্যবোধকে তুলে ধরছেন যার জন্য আজকের তরুণ প্রাণ উৎসর্গ করবে? আজকের উপন্যাসে তাই ভাঙার-ই ছবি পাই, নতুন ঐতিহ্য রচনা করে তুলতে পারেনি।

নাট্যরীতির উপন্যাস

শেক্সপীয়রের এক নায়ক যখন বেদনার্ত কণ্ঠে বলে : To be or not to be that is the question তখন নায়কের দারুণ মর্মদাহ আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করে, সন্দেহ নেই। আমরা জানতে পারি জীবনের কী আত্মিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে সে। সে সঙ্কট এমনই যে বেঁচে থেকে কিছুতেই তার সমাধান সম্ভব নয়। আবার এই অস্তিত্বের সমস্যা নিয়ে নিজের ভেতরে যে প্রচণ্ড তোলপাড় চলেছে, তার কথা কাউকে প্রকাশ করেও বলা যায় না, কারণ কেউ সে-কথা ঠিক যেন বুঝতেই পারবে না। না বুঝতে পারার কারণ, এ-সমস্যা যে তারই। তারই বিশেষ অন্তরপ্রকৃতি দিয়েই এই সমস্যাটিকে বুঝতে হবে। তার চরিত্র তার অনুভূতি, তার সত্তাতে এই সমস্যাটির একটা বিশেষ চেহারায় ফুটে ওঠে।

এই বিশেষত্বটিকে উপন্যাস-লেখক বুঝিয়ে বলেন। চরিত্রের অন্তর্নিহিত যন্ত্রণাটিকে তিলে তিলে সূক্ষ্মভাবে নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেন—এমন করে বোধ হয় কোনো চরিত্র নিজেকে বোঝাতে পারে না। নাটকের স্বগতোক্তিগুলি স্বাভাবিক কিনা—আমরা প্রশ্ন করতেই পারি। সে-প্রশ্ন ঠিক সাহিত্য-পাঠকের প্রশ্ন হবে না। সাধারণ মানুষ হিসাবেই প্রশ্ন করে বলতে পারি, এরকম দীর্ঘ আত্মবিশ্লেষণ তো বাস্তবে কাউকে করতে দেখি না। নাটকে কোনো চরিত্র যখন উচ্চকণ্ঠে নিজের অন্তরের ভাবনাগুলিকে এমন করে ব্যক্ত করে—তখন সাহিত্যের জগৎ বলেই আমরা এটাকে মেনে নিই। যদি ঘটনাটিকে সাহিত্যের বিশেষ অধিকার বলে ধরে নিই, তবু আর-একটা কথাও ভাবতে পারি। কোনো চরিত্র যখন এমন করে নিজেকে ব্যক্ত করে, তখন সেই অভিব্যক্তির ভাষাও কি তার পক্ষে সম্ভব? আমরা আত্মগতভাবে কোনো ভাবকে সশব্দে প্রকাশ করে ফেলতে পারি, কিন্তু এমন গুছিয়ে, এমন পরম্পরাক্রমে, এমন শব্দসঙ্কেতে নিপুণভাবে ধারাবাহিকরূপে মনের ভাবটিকে সাজিয়ে বলাটা যতখানি বাস্তব-চরিত্রের পক্ষে সম্ভব, তার চেয়ে অনেক বেশি সম্ভব তাঁর পক্ষে যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন। আমার মানসিক ভাবদ্বন্দ্ব আমার কাছে স্বভাবতই অনুভূতির বিষয়, কিন্তু তাকে গুছিয়ে বলাটা আমার পক্ষে সম্ভব নয় ঠিকই। এমন করে গুছিয়ে বর্ণনা করতে পারবেন, যাঁর লেখার ক্ষমতা আছে তিনিই। বিনোদিনী যে তীব্র বেদনাকে মনে মনে বহন করছে, কোনো বাস্তবে অস্তিত্ববতী নারী কি তাকে ঠিক তেমনি করে সাজিয়ে বলতে পারে? তাকে যে-লেখক সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তাকে নানা সঙ্কেতে, ভাষায় ব্যঞ্জিত করে তোলেন। কিন্তু আমরা যে বিনোদিনীকে পেলাম, সে-কোন বিনোদিনী? এ-বিনোদিনী লেখকের রচনা। এ কোনো মধ্যবিত্ত ঘরের খাওয়া-পরা সমস্যা-কণ্টকিত সত্যকার বিনোদিনী হতেই পারে না। কেননা, সেই সত্যকার বিনোদিনী কোনো দিনই নিজেকে এমন করে প্রকাশ করে বলতে পারবে না। তার কারণটা সোজা—সে

রবীন্দ্রনাথ নয়। রবীন্দ্রনাথ যে-বিনোদিনীকে চোখের বালিতে তিলে তিলে বিশ্লেষণ করে দিলেন, সে রবীন্দ্রনাথেরই কল্পিত। কোনো বাস্তব নারী যখন প্রণয়বিদ্ধ হয় তখন এমন করে ব্যাপ্ত ভাবে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে কাব্যময় ভাষায় একটি একটি মুহূর্তের অনুভূতিকে উন্মোচিত ও বিশ্লেষণ করে সে কখনোই বোঝাতে পারে না, বোঝায় না। মনের এই বিশ্লেষণ লেখকই করেন। কিন্তু মজা এই যে লেখক মনে করেন, যে-মানুষ নিজের অন্তরকে কথা দিয়ে বোঝাতে পারে না, তাকেই তিনি প্রকাশ করে দিলেন। আসলে যাকে প্রকাশ করলেন, তিনি লেখকেরই কল্পিত মানুষ মাত্র।

সেকালের নাটকীয় প্রতিভা চেয়েছিল মানুষকে নিজের মতো করেই ফুটতে দিতে। লেখক কোনো ব্যাখ্যা করবেন না, কেননা ব্যাখ্যা করতে গেলেই সে হয়ে উঠবে লেখকেরই কল্পিত সৃষ্টি। হ্যামলেট চলুক তার নিজের মতে, লীয়র নিজেই বিবেচনা করুক তার কর্তব্য কি। লেখক শুধু তাদের কয়েকটি বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দেবেন। যেখানে তাদের মানসিক প্রতিক্রিয়া কি, তারা নিজেরাই মুখ ফুটে বলবে। হ্যামলেট বলুক :

> To be, or not to be—that is the question ;
> Whether'its nobler in the mind to suffer
> The slings and arrows of outrageous fortune,
> Or to take arms against a sea of troubles,
> And by opposing end them ? To die, to sleep—
> No more ; and by a sleep to say we end
> The heart-ache and the thousand natural shocks
> That flesh is heir to, 'Tis a consummation
> Devoutly to be wished. To die, to sleep ;
> To sleep, perchance to dream. Ay, there's the rub ;
> For in that sleep of death what dreams may come,
> When we have shuffled off this mortal coil,
> Must give us pause, There's the respect
> That makes calamity of so long life ;
> For who would bear the whips and scorns of time,
> Th' oppressor's wrong, the proud man's contumely,
> The pangs of despis'd love, the law's delay,
> The insolence of office, and the spurns
> That patient merit of the unworthy takes
> When he himself might his quietus make
> With a bare bodkin ? Who would these fardels bear,
> To grunt and sweat under a weary life,
> But that the dread of something after death—
> The undiscoversed country, from whose bourn
> No traveller returns—puzzles the will,

And.makes us rather bear those ills we have
Than fly to others that we know not of ?
Thus conscience does make coward of us all ;

—*Hamlet Act 3.Sc.I.*

হ্যামলেটের এই দীর্ঘ স্বগতোক্তি কাব্যসৌন্দর্যে অপরূপ, তেমনি অপূর্ব এর দার্শনিক জীবন-জিজ্ঞাসা, তার বিষণ্ণ প্রতিক্রিয়া। কেন এ জীবন, কী তার উদ্দেশ্য, কোথায় এর পরিণতি এর কোনো সদুত্তর নেই। মৃত্যুতেই কি সর্বসিদ্ধি—এর উত্তরই বা কে দেবে। সেই তিমিরাচ্ছন্ন দেশ যেখান থেকে কেউ ফেরে না, তার ভাবনাতেও আমরা এই যন্ত্রণাবিদ্ধ জীবনকে ছেড়ে যেতে চাই না। হ্যামলেটের এই উক্তিতে সচেতন এবং অ-চেতন মন মিশে গিয়েছে—The pangs of despised love, the law's delay, the insolence of office—নানা ব্যর্থতার স্মৃতি তার সমগ্র চেতনাকে মথিত করেছে। এই বিভিন্ন ভাবনাগুলি একসঙ্গে এসে তার প্রবণতাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে চায় কিন্তু মৃত্যুই কী আর সর্বজ্বালাহর ঔষধ?

হ্যামলেট নিজের মনের তীব্র দ্বন্দ্বকে যে-ভাবে প্রকাশ করে বলছে, দ্বন্দ্বকে যদি বিশ্লিষ্ট করে দেখা যায় তবে একটা জটিল মানবমনের ছবি পাওয়া যাবে। এই মানবমন প্রকাশিত হয়েছে দীর্ঘ স্বগত ভাষণে। এর দীর্ঘতা অস্বাভাবিক সন্দেহ নেই, কিন্তু এ ছাড়া বিষাদাতুর রাজপুত্রের মনের চেহারাটিও পাওয়া যেত না। এই বিশিষ্ট চরিত্রটিকে আমাদের দরকার। সেটাই তো সৃষ্টি। সেটাই তো সাহিত্য। নাটকে চরিত্রকে পাই, যেমন হ্যামলেটকে পাই, তেমনি উপন্যাসেও পাই চরিত্রকে। চরিত্রই মুখ্য যেমন নাটকে, তেমনি উপন্যাসে। নাটকে যে-চরিত্রর দেখা মেলে, সে বিবর্ণ অর্থহীন নয়। নানা ঘটনার সংঘাতে সেই চরিত্রের নিহিত বিশেষ মনটি উন্মোচিত হয়। সেই জন্যই চরিত্রের জন্য চাই ঘটনা বা প্লট। ঘটনা সাজিয়ে একটা কাহিনীর কাঠামো লেখক তৈরি করে নেন। সেই ঘটনার মধ্যে চরিত্রকে ফেলে দিয়ে তার মনের নানা অভিব্যক্তি ঘটান। এই সংঘাতগুলি না থাকলে মনটি ফুটে উঠত না। ঘটনা যেন ঘা দিয়ে দিয়ে মনের বিকাশকে সম্ভব করে তুলছে। বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর উপন্যাসে :

'বেদগ্রামের সেই গৃহ মনে পড়িল। সেখানে প্রাচীর পার্শ্বে, শৈবলিনী স্বহস্তে করবীর বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিল—সেই করবীর সর্বোচ্চ শাখা প্রাচীর অতিক্রম করিয়া রক্তপুষ্প ধারণ করিয়া, নীলাকাশকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া তুলিত, কখন তাহাতে ভ্রমর বা ক্ষুদ্র পক্ষী আসিয়া বসিত। তাহা মনে পড়িল। তুলসীমঞ্চ—তাহার চারিপার্শ্বে পরিষ্কৃত, সমার্জিত ভূমি, গৃহপালিত মার্জার, পিঞ্জরে স্ফুটবাক্ পক্ষী, গৃহপার্শ্বে সুস্বাদু আম্রের উচ্চ বৃক্ষ—সকল স্মরণপটে চিত্রিত হইতে লাগিল। কত কি মনে পড়িল। কত সুন্দর, সুনীল, মেঘশূন্য আকাশ, শৈবলিনী ছাদে বসিয়া দেখিতেন ; কত সুগন্ধ প্রস্ফুটিত ধবল কুসুম, পরিষ্কার জলসিক্ত করিয়া চন্দ্রশেখরের পূজার জন্য পুষ্পপাত্র ভরিয়া রাখিয়া দিতেন। ···শৈবলিনী

আবার নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভাবিতে লাগিলেম, "মনে করিয়াছিলাম গৃহের বাহির হইলেই প্রতাপকে দেখিব…"

তারপর আবার তার ভাবনা:·

'দুরন্ত ইংরেজ ইহার ভয়ে বশ হইয়াছিল—আমার এ দুরন্ত হৃদয় ইহার ভয়ে বশ হইল না। মরিব? না—আজ নহে। মরি, ত সেই বেদগ্রামে গিয়া মরিব। যিনি আমার স্বামী তাঁহাকে কি বলিয়া মরিব? কথা ত মনে করিতে পারি না। আমি তাঁহার যোগ্যা নহি বলিয়া আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। তাতে কি তাঁর কোন ক্লেশ হইয়াছে? তিনি কি দুঃখ করিয়াছেন? না আমি তাঁহার কেহ নহি। পুঁতিই তাহার সব। তিনি আমার জন্য দুঃখ করিবেন না। একবার নিতান্ত সাধ হয়, সেই কথাটি আমাকে কেহ আসিয়া বলে, তিনি কেমন আছেন, কি করিতেছেন।…"

শৈবলিনীর এটা স্বগত ভাষণ। কয়েকটি স্মৃতিচিত্র মনে ভেসে আসছে। এই চিত্রগুলি নিছক ছবি নয়, এই ছবি শৈবলিনীর মনের গতির দ্যোতক। ঘর ছেড়ে এসে ঘরের কথা মনে পড়ে—বোঝা যায় তার হৃদয়ের একটা নোঙ্গর কোথায় বাঁধা আছে, আবার সেই সঙ্গে ভেসে আসে চলার টান। শৈবলিনীর প্রবল আত্মদহন প্রকাশিত হয়েছে দ্বিতীয় অংশে। স্বামীর প্রতি অসীম অভিমান তার। কিন্তু সেই সঙ্গে স্বামীর সংবাদ জানার আকুল ইচ্ছা।

হ্যামলেটের মতো শৈবলিনী দার্শনিক ভাবনায় বিহ্বল নয়। সে শুধু তার নিজের অসহ্য দ্বিধাকে নিয়ে অন্ধ। প্রতাপের জন্য ঘর ছেড়েছে, কিন্তু স্বামীর স্মৃতি তাকে ব্যাকুল করে। দুয়ের আকর্ষণে তার নারীহৃদয় বিবশ। শৈবলিনীর এই মুহূর্তের মনোভাবকে বঙ্কিম দেখিয়েছেন কয়েকটি স্মৃতিমূলক চিত্র দিয়ে। এই চিত্রগুলিকে সাজিয়ে নিলেই তার মনের বঙ্কিম গতিকে বোঝা যায়। দুই দিকের আকর্ষণ, একটি আবেগের আর-একটি অভিমানের। এই দুয়ে মিলে শৈবলিনীর নারী-ব্যক্তিত্ব, হ্যামলটের পুরুষ-ব্যক্তিত্ব যেমন জীবন ও মৃত্যুর রহস্যচিন্তায় দোলাচল। দুটি চরিত্রই স্বগতভাষণরত হয়েছে ঘটনার এক এক সংঘাতে, পরিস্থিতিতে। প্লটকে এভাবে না সাজালে চরিত্রের এই বিকাশকে পেতাম না।

চন্দ্রশেখর উপন্যাস হলেও যে-ভাবে লেখক শৈবলিনীর ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়েছেন, তাতে তাকে বলতে হয় নাটকীয়। হ্যামলেট সোজাসুজি নিজের মনোভাবটিকে সরব বাক্যে উচ্চারণ করে তার চরিত্রের জটিল চেহারাটিকে আমাদের কাছে স্পষ্ট করেছে। এও মনোবিশ্লেষণের ছদ্ম আবরণ মাত্র। অবশ্য 'বিশ্লেষণ' শব্দটিকে আক্ষরিক অর্থে এখানে ধরা যায় না বটে। কারণ এটা ঠিক চিরে চিরে ভাবগুলিকে আলাদা করা নয়, বরং সব মিলিয়ে সমগ্র হয়ে ওঠা। তবু আগে লক্ষ্য করা গেছে, স্বগতভাষণের মধ্যে একাধিক বিভিন্ন প্রবণতা আছে। শৈবলিনীর উক্তি-ও নাটকের মতোই একোক্তি এবং সরব উচ্চারণ। কিন্তু তার আত্মভাষণে বিশ্লেষণের প্রকৃতি—বিভিন্ন মানসিক প্রবণতা দ্বারা চিহ্নিত। কয়েকটি চিত্রের সাহায্যে তার বিশ্লেষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

একেই কি 'আঁতের কথা' বলা যায় না? শৈবলিনী কিংবা হ্যামলেট কেউ যদি স্বগতভাষণ না করত, কেবল যদি তাদের বহিরঙ্গ আচরণটাই দেখানো হত, তা হলে অবশ্যই চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অনেকটাই হত অনুমান-নির্ভর। যে অনুমান আমরা তাদের আচরণ থেকে করি, সেটাই প্রত্যয় হয়ে ওঠে তাদের স্বমুখোচ্চারিত আত্মবর্ণনায়। শুধু প্রত্যয় নয়, প্রত্যয়ের সঙ্গে আরও ছবি উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। স্বগতভাষণ চরিত্রকে পূর্ণতা দিয়েছে। এবং এই স্বগতভাষণে তাদের অন্তর্জীবন আলোকিত হল।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'আঁতের কথা' বলতে এ ছাড়াও আরো কিছু বুঝিয়েছেন। ওপরে যে দুটি নমুনা দিয়ে আলোচনা করেছি, তার একটি নাটক থেকে নেওয়া আর একটি উপন্যাস থেকে। কিন্তু উপন্যাস হলেও এ প্রায় নাটকের গুণে অন্বিত। শৈবলিনী হ্যামলেটের মতোই নিজের অন্তরের দিকে তাকিয়ে কথা বলছে। নিজেকে নিজেই বিশ্লেষণ করছে যেন। তার বিশ্লেষণের বস্তু হচ্ছে তার মনের অবাধ্য প্রবৃত্তি, কখনও স্বামীর প্রতি কখনও প্রতাপের প্রতি ধাবিত। তার আকর্ষণের সঙ্গে কয়েকটি বহুপরিচিত অভ্যস্ত স্মৃতিও জড়িয়ে আছে। বস্তুত তার আকর্ষণ কয়েকটি অভ্যস্ত বস্তুর আশ্রয়েই যেন অলক্ষ্যে রচিত হয়েছে। নিজে সেটা বুঝতে না পারলেও তার স্মৃতি-সঞ্চিত কয়েকটি দৃশ্যে পাঠকেরা তা বুঝতে পারে। আবার এরই সঙ্গে অভিমানের আভাসও পাওয়া যাচ্ছে। এ সব মিলিয়ে বোঝা যায় শৈবলিনীর প্রবৃত্তি সূক্ষ্মতর পথে সঞ্চারিত হয়ে যাচ্ছে। এখানে দেখি উপন্যাসোচিত মনোবিশ্লেষণ, যদিও সেটা নায়িকার আত্মকথন দিয়ে নাটকীয় ভাবে রচিত। এই সূক্ষ্ম ভাবসংবেদনগুলির আঘাত-সংঘাতকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'আঁতের কথা'। বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে তার শুরু মাত্র। চোখের বালির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বললেন 'মনের সংসারের সেই কারখানাঘরে, যেখানে আগুনের জ্বলুনি হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি জেগে উঠতে থাকে' মনের সংসারের সেই কারখানা ঘরের ছবিটা বঙ্কিম বা ক্লাসিকাল নাটকে পুরো ফোটেনি। আমরা সকলেই জানি চরিত্রের দ্বন্দ্ব দিয়েই নাটক। অথচ সে-দ্বন্দ্ব হচ্ছে আমাদের প্রচলিত ধারণায় মনের অভ্যন্তরের, কিন্তু আসলে দেহপ্রবৃত্তির সঙ্গে নৈতিক বোধের, অথবা এক প্রবৃত্তির সঙ্গে অন্য প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব। এমন কথাটার পারিভাষিক অর্থ আরও বিশিষ্ট। দুর্দাম প্রবৃত্তির সঙ্গে অন্য অচিরস্থায়ী উপলক্ষগত ভাবসংবেদন আমাদের আচরণে কিছু বিপর্যয় ঘটায়। মনোবিশ্লেষণ এই ভাবসংবেদনগুলির পরীক্ষা। সেকালের নাটকে অথবা বঙ্কিমরচিত উপন্যাসে অসংযত বাসনা প্রবৃত্তি, লোভের উন্মত্ত প্রকাশ, আত্মত্যাগের দিব্য আদর্শ বা এই শ্রেণীর প্রবৃত্তির লীলা রচিত হয়ে থাকে। এই প্রবৃত্তি জেগে ওঠে ঘটনা ও কাহিনীর বিচিত্র পরিস্থিতিতে। তাই প্লটের গুরুত্ব এ সব সাহিত্যকলায় যত বেশি, মনো-বিশ্লেষণের প্রয়োজন ততই কম।

এইজন্যই মনোবিশ্লেষণের উপলক্ষ্য সাধারণ জীবন-কাহিনীতেই বেশি, ঐতিহাসিক কাহিনীতে সে রকম নেই। ঐতিহাসিক কাহিনীতে ঘটনা এবং প্লটের

চাকচিক্য। মধ্যবিত্ত সমকালীন সংসার-কাহিনীতে ঘটনাব্যতিরিক্ত ব্যক্তিমনের ছবিই স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত। সকলেই রাজসিংহ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা স্মরণ করবেন। ইতিহাসের গতির দিকে তাকিয়ে অনেক আবশ্যককেই বঙ্কিম বাদ দিয়েছেন তার মধ্যে মনোবিশ্লেষণও ছিল। বঙ্কিমের অনেক উপন্যাসেই মনোবিশ্লেষণ যথোপযুক্তভাবে থাকলে চরিত্রের অনেক পরিবর্তনেরই কারণ পাওয়া যেত। ওই অভাবটুকু লেখক পাঠকের বিবেচনার উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। তবু বঙ্কিম কোনো কোনো ক্ষেত্রে সে-দায়িত্ব নিজে পালন করেছেন, আবার কখনও চরিত্রকেই তার আভাস দিতে দিয়েছেন। যেমন করেছেন শেক্সপীয়র। লেখক যখন দায়িত্বভার তুলে নিলেন অন্তর্লোককে বুঝিয়ে দেবার, তখন শুধু যে বাইরের ঘটনার চাকচিক্য হ্রাস পেয়ে এল, তাই নয়, নতুন ধরনের একটা কৌতূহলকে জাগিয়ে দিলেন তিনি। মানুষের মনের ভিতরের জগৎটা কম জটিল নয়। এর সম্বন্ধে সব কথা বলে শেষ করা যায় না, এর কোনো ছক বাঁধা নেই, কাজেই তার বৈচিত্র্যেরও শেষ নেই। নানাভাবে নানা ভঙ্গিমায় নানা সঙ্কেত ইঙ্গিতে ভাষার কারুকার্যে মানব-মনের জটিল গতিপ্রকৃতিকে ব্যঞ্জিত করতে থাকলেন। অনেক সময়েই দেখা গেছে, কাহিনী থেমে রয়েছে, লেখক চরিত্রের মানসিক ভাবদ্বন্দ্বগুলির বিশ্লেষণে মগ্ন হয়ে গেছেন।

'চোখের বালি'র কাহিনী মধ্যবিত্ত সমাজেরই কাহিনী, এক অখ্যাতনামা অকিঞ্চিৎকর পরিবারের নিভৃত হৃদয়লীলার উপন্যাস। এই উপন্যাসে বস্তুতই গল্পের তেমন আকর্ষণ নেই, যে আকর্ষণ বঙ্কিমের উপন্যাসে থাকে। বিধবা বিনোদিনী হৃদয় নিয়ে যে বিপদে পড়েছিল, সেটা ভিন্নতর স্বাদের গল্প। তার প্রণয়ের মধ্যে আত্মপ্রবঞ্চনা আছে, প্রতিহিংসা আছে, করুণা আছে—সব মিলে তার ব্যক্তিরূপটাই অনন্য। মনের জগতের সেই সব ভাব সংঘাতগুলি লেখক কতভাবেই না সংকেতিত করেছেন, কত ইশারায়, ভাষার কত ইঙ্গিতে। তিনি নায়িকার এক একটি মুহূর্তের অনুভূতিকে বিশ্লেষণ করেছেন, কখনও কাব্যিক ব্যঞ্জনা দিয়ে কখনও অন্যের উক্তি দিয়ে কখনও সচেতন আচরণে কখনও অচেতন আচরণের বর্ণনা করে। মনোবিশ্লেষণমূলক উপন্যাস নামে সাহিত্যে উপন্যাসের যে শ্রেণী নির্দেশ করা হয়, তাতে গল্পের কাঠামো একটা থাকে বটে তার চরিত্রই সেখানে প্রধান এবং চরিত্র বলতে মনোধর্মী চরিত্রকেই বোঝায়। কেননা চরিত্রের আর একটা শ্রেণী দেখছি নাটকে কিংবা নাট্যধর্মী উপন্যাসে। সে-চরিত্রও Action-ধর্মী। চরিত্র মনোধর্মী হয়ে উঠেছে বিংশ শতকের কিছু পূর্ব থেকেই। এর কারণ হিসাবে অনুমান করা যায় মনোবিদ্যার বিজ্ঞান হিসাবে গুরুত্ব পাওয়াকে। মনোবিদ্যায় চেতনার যে স্তর এবং শ্রেণী আবিষ্কৃত হয়েছে, তার কিছু প্রভাব উপন্যাসে পড়বেই, বিশেষত উইলিয়ম জেম্সের মনোবিদ্যাকে বৈজ্ঞানিক ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করার ফলে ; উপন্যাসে ব্যক্তিচরিত্রের প্রাধান্য—তার ফলে বৈজ্ঞানিক সমর্থন লাভ করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। পূর্বতন ধারণায় ব্যক্তি এবং জগৎ ছিল

আলাদা। যে-নায়ক চিন্তা করে, কল্পনা করে, সে একটা কিছু নিয়েই ভাবে। ফলে সেখানে ব্যক্তি এবং পরিপার্শ্ব দুই সত্তা, তাই সমাজে বা জীবনে ব্যক্তির কর্মক্রিয়া নিয়েই কাহিনী গড়ে উঠেছে। যাকে আমরা ন্যাচারিলিজ্‌ম বা প্রকৃতিবাদ বলি, সে বস্তুত প্রকৃতি-পরিবেশের নিখুঁত চিত্র। চরিত্র সেই প্রকৃতির সঙ্গে কর্মের দ্বারা চিন্তার দ্বারা যুক্ত। জেমসের মতে ব্যক্তির চেতনাই সমস্ত জগৎকে সৃষ্টি করে। একে তিনি বলেছেন pure experience। মানুষের মনের এই সর্বাত্মকতার প্রকাশ ঘটেছে মনোবিশ্লেষণাত্মক উপন্যাসে। মনে রাখতে হবে একদিকে যেমন জেমসের চিন্তায় মনোধর্মী ব্যক্তিবাদের উদ্ভব, তেমনি ফ্রয়েডের চিন্তায় সেই মনেরই নানা স্তরের আবিষ্কার। যে নায়ক বা নায়িকা ভাবছে সে নিজের দিক দিয়েই স্বভাবত ভাবছে, তার ভাবনার নিয়মটা অনেকটা তার নিজেরই সৃষ্টি তেমনি যে-মনটি ভাবছে সে যে সচেতনভাবেই ভাবছে, তা না-ও হতে পারে। অর্থাৎ তার ভাবনার মূলে অনেক অচেতন প্রেরণাও থাকতে পারে। তখনই ব্যক্তির আচরণ বা কর্ম দুরবগাহ ও জটিল হয়ে ওঠে। মনোবিশ্লেষণাত্মক উপন্যাসে এই জটিল চরিত্রের ছড়াছড়ি। কিন্তু আর-একটি কথা ভাববার আছে। নাটকে বা উপন্যাসে আমরা যে জীবনটাকে দেখি, সেটি কতখানি স্বয়ম্ভর? অর্থাৎ প্লটটা তো লেখকেরই বানানো। জীবনে এ রকম প্লট সত্য সত্যই কি হয়ে থাকে? সত্য সত্যই যা ঘটে, একটুও ব্যতিক্রম না করে তাকে বর্ণনা করায় লেখকের কোনোই শিল্পকৃতিত্ব নেই—তাতে কোনো গল্প হয় না। There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy. এটাও নাটকীয় চরিত্রেরই কথা। জীবনে যা ঘটে তত্ত্ব দিয়ে তা নাকি পাওয়া যায় না। কিন্তু জীবনে সেটা ঘটে গেলেই সেটা আর গল্প নয়। লেখক কোনো বাস্তব অস্তিত্বসম্পন্ন চরিত্রকে উপন্যাসে নিয়ে এলে সেটা এক অর্থে কল্পিতই হয়ে উঠবে। জীবনের চরিত্রকে কখনোই নিখুঁতভাবে তিনি নিয়ে আসেন না। রবীন্দ্রনাথের গোরা অথবা শরৎচন্দ্রের কিরণময়ীর মধ্যে বাস্তবের আভাস যাই থাক, উপন্যাসে সেটা লেখকেরই সৃষ্টি। অর্থাৎ এই চরিত্র কোন পরিস্থিতিতে কী রকম আচরণ করবে লেখক সেটা স্থির করে দেন। বাস্তব ঘটনাতেও সে যে ঠিক সে-রকমই আচরণ করবে বা কথা বলবে এ রকম দাবী করা অযৌক্তিক। চরিত্র-সৃষ্টিই নাকি উপন্যাসকারের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু এতাবৎকাল উপন্যাসকারেরা করেছেন কি? তাঁরা আমাদের কল্পিত এক গল্প দিয়েছেন, সেই গল্পের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেই লেখক চরিত্র সৃষ্টি করে এসেছেন। সেই সঙ্গতিটাও কল্পিত। সুতরাং ভারজিনিয়া উলফ বললেন:

They have laid an enormous stress upon the fabric of things. They have given us a house in the hope that we may be able to deduce the human beings who live there.

চরিত্র-নির্মাণ যে লেখকের লক্ষ্য এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সেটা এ-ভাবে নয়। সাহিত্যে ন্যাচারালিজম আমাদের দিয়েছে বস্তুজগতের ছবি, কিন্তু

বস্তুতই সেটা লেখকমনের কল্পিত ঘটনা-সংস্থান ও কাহিনী বিন্যাস ছাড়া কিছুই নয়। তার চেয়ে চরিত্রকে যদি সত্যি সত্যি যথাযথ ফুটে উঠতে দিতে হয়, তবে তার পদ্ধতি হবে অন্য রকম—মনোবিশ্লেষণ করেও নয়, কিংবা প্লট-নির্দিষ্ট তথাকথিত নাটকীয় বস্তুনিষ্ঠতা দিয়েও নয়। 'বস্তুনিষ্ঠা' কথাটিও পুনর্বিবেচনা করা দরকার। কেননা যে-নাটকীয় কাহিনীর দ্বারা তথাকথিত বস্তুনিষ্ঠ চবিত্র তৈরী হয়েছে, সে কাহিনীটি আসলেই লেখক-কল্পিত। চরিত্রের সংলাপ আচরণ, কর্ম ক্রিয়া সবই লেখক-কল্পিত। এ-কথার অর্থ এই যে সেই চরিত্র লেখকের কল্পিত কাহিনী-ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেই গড়ে উঠেছে। সে-ও তাহলে ফরমায়েসী। মানুষের জীবনে ঘটনা ঠিক বাছাবাছা সংলাপ, বাছাবাছা কাজ দিয়ে তৈরি হয় না। লেখক যখন কোনো চরিত্রের আচরণ পরম্পরাকে নির্বাচন করে নিচ্ছেন, তখনই সেটা লেখক-নিষ্ঠ হতে বাধ্য। কৃষ্ণকান্তের উইলে রোহিণী সে-কয়টি দৃশ্যের মধ্যে উপস্থাপিত হয়েছে, অথবা যে-কয়টি কথা সে বলেছে, সেইটুকুই রোহিণীর সমগ্র চেহারা নয়। লেখক তাঁর গল্পটিকে দাঁড় করাবার জন্য প্রয়োজনমতো নির্বাচন করে নিয়েছেন মাত্র। এমনি করে মিলন-বিরহ, হাসিকান্না, ঘৃণা ভালোবাসা দিয়ে এমন চরিত্র নির্মাণ করেছেন যে, যদি সত্য সত্যই এ-সব চরিত্র রক্তমাংসের দেহ নিয়ে আসত, তবে মনে হত যেন তারা লেখক-বিধাতার হাতের পুতুল, তাঁরই ইচ্ছায় পরিচালিত। একেই কী বলব চরিত্র-সৃষ্টি যার জন্য উপন্যাসকারের এত উদ্যম, এত প্রয়াস? চরিত্রই যদি লেখকের সবচেয়ে অভিপ্রেত হয়ে থাকে, তবে, কৃত্রিম প্লটের হাত থেকে তাকে মুক্তি নিতে হবে। প্লট আসলে আকাশকুসুম মাত্র। প্লট আর জীবন সম্পূর্ণ বিপরীত। জীবন মুক্ত। তার বিচিত্র বিভিন্ন পরিস্থিতি কতো অভিনব অপ্রত্যাশিত মুহূর্তের সৃষ্টি করে। রাগ, দ্বেষ, ভালোবাসা, ঘৃণা, করুণা, যৌনক্ষুধা, মৃত্যুর যন্ত্রণা—কখন কোন আবেগ তাকে অধিকার করবে কেউ কি হিসাব করে বলতে পারে? মনের মধ্যে এসে পড়ছে অজস্র ছায়া নানা দিক থেকে, নানা সময়ে, নানা স্থানে তাই দিয়ে এক-একদিনের এক এক ব্যক্তির অস্তিত্ব। এদের মধ্যে নির্বাচন করে যে ব্যক্তিকে লেখক গড়ে এসেছেন, সে বস্তুতই বাস্তব নয়, জীবন্তও নয়।

অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে নিরন্তর যাত্রা যে মানুষের, সে মানুষকেই উপন্যাসে ফুটিয়ে তোলার নতুন উদ্যম এল সাহিত্যে। কোনো প্রথায় বাঁধা মানুষ নয়, সত্যিকারের জীবন্ত মানুষ। কারণ:

Life is not a series of giglamps symmetrically arranged ; life is a luminous halo, a semi-transparent envelope surrounding us from the beginning of consciousness to the end. Is it not the task of the novelist to convey this varying, this unknown and uncircumscribed spirit, whatever aberration or complexity it may display with as litte mixture of the alien and external as possible ?

—Woolf, The Common Reader, The Modern Novel

এর অর্থ হচ্ছে এই যে উপন্যাস হবে শুধু চরিত্রবিশেষের প্রতিভাস বা impression-এর ধারা। কোনো সুনির্দিষ্ট গল্প গড়ে তুলবার জন্যে নয় কিংবা সুখী বা অসুখী, প্রেমিক বা দুর্বৃত্ত, বীর বা ভীরু কোনো সিদ্ধান্ত দেবার জন্যেই নয়। মনোবিশ্লেষণাত্মক উপন্যাসে লেখক চরিত্রের মনের গতিকে বিশ্লেষণ করেন তার আচরণকে ব্যাখ্যা করেন, অন্তর্জীবনের নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে বুঝিয়ে দেন। কিন্তু এ-বিশ্লেষণ করবার অধিকারও লেখকের রাখা উচিত নয়। তা করলে লেখককে বস্তুত Subjective হয়ে পড়তে হয়, এ কথা আগেই বলেছি। লেখক যেমন বানানো প্লট দেবেন না তেমনি ঘটনা নির্বাচনও করবেন না, ব্যাখ্যাও করবেন না। বাকি তা হলে থাকছে চরিত্রের প্রতি মুহূর্ত-লব্ধ impression। কোনো মানুষই মনের কাজ বন্ধ করে বসে থাকতে পারে না। কত impression পড়ছে তার মনে, কত স্মৃতি, কত প্রচ্ছন্ন কামনা, কত আনন্দের স্মৃতি, কত অভিজ্ঞতা। শুধু স্মৃতি নয়, প্রতি বর্তমান মুহূর্তের ছাপ অজস্র অপরিচিত। একটা গন্ধ থেকে কত কথাই মনে পড়তে পারে, বুদ্ধদেব বসুর 'তুলসী গন্ধ' গন্ধটি যারা পড়েছেন তাঁরা জানেন। এই impression গুলোকে লেখক যদি ব্যাখ্যা করতে যান, তবেই তালভঙ্গ। স্রোতের ধারায় মেঘের ছায়া পড়ে, পাখির ছায়া পড়ে, সূর্যের আলো পড়ে, আবার তীরবর্তী গাছেরও ছায়া পড়ে, এদের সংলগ্ন করবার জন্য কোনো ব্যাখ্যা করতে গেলে সেটা হবে লেখকের কথা—স্রোতের নয়। কিন্তু জলের স্রোতটা যে স্বচ্ছ, সে-যে ঊর্মিমুখর অথবা সে যে ঘোলাটে অথবা সবুজাভ সেটা ফুটে উঠুক আপনা থেকেই। ওই স্রোতটাই তার আপন চেহারা নিয়ে সহজেই প্রতিভাত হবে। চরিত্রে চেতনা প্রবাহই হচ্ছে ওই স্রোতের মতো। নিরন্তর তার মধ্যে এসে ঘটছে অসংখ্য প্রতিফলন।

এতে লেখকের যদি কোনো ব্যাখ্যাতার ভূমিকা না থাকে, কিংবা নায়কের চেতনাকে বিশিষ্ট ছকে ফেলার প্রয়োজন না থাকে, তবে এই রচনাকেই তো যথার্থ নাটকীয় বলা যায়। যারা এই টেকনিকে উপন্যাস লিখেছেন, তারা একেই যথার্থ নাটকীয় বলে দাবী করেছেন। এই টেকনিকটার নাম দেওয়া হয়েছে—'stream of consciousness'। এই নামটি নেওয়া হয়েছে আমাদের পূর্বকথিত মনস্তত্ত্ববিদ-দার্শনিক James-এরই লেখা থেকে:

Consciousness does not appear to itself chopped up in bits.....It is nothing joined ; it flows....Let us call it the stream of thought, of consciousness, or of subjective life.

উপন্যাসের টেকনিক প্রসঙ্গে এই শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেছিলেন মে সিনক্লেয়ার ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে ডরথি রিচার্ডসনের উপন্যাসের আলোচনা-প্রসঙ্গে। বাংলায় আমরা আক্ষরিক অনুবাদ করে নিয়েছি চেতনাপ্রবাহ পদ্ধতি বলে।

এতে পাঠক এবং চরিত্রের মধ্যে লেখকের যেন কোনো উপস্থিতি নেই। পাঠক সোজাসুজি চরিত্রের সঙ্গ নিয়ে নেন। পূর্বাগত নাট্যরচনা-রীতিতে যেমন

লেখক থাকেন অদৃশ্য, এতেও তাই। পার্থক্য এই যে নাটকই হোক আর উপন্যাসই হোক এতকাল ঘটনা যেন ছিল অতীতের বর্ণনা বা অবতারণা। কিন্তু চেতন-প্রবাহ পদ্ধতিতে ঘটনায় বর্তমান ছাড়া কিছু নেই। স্মৃতি আসে কিন্তু আসে বর্তমানের অভিজ্ঞতার সূত্রে জয়েশের ইউলিসিসের কাহিনী একটি বর্তমান দিনের। গোপাল হালদারের 'একদা'ও তাই। আলবেয়ার কামুর উপন্যাস-পদ্ধতির সঙ্গে এই সূত্রে পার্থক্য এই যে অস্তিবাদে থাকে সচেতন শূন্যতাবোধ। প্রতি মুহূর্তে যে-ঘটনা ঘটেছে তার কোনো অর্থ নেই, অর্থ নেই বলেই এতে জীবন-জিজ্ঞাসা আছে, প্রশ্ন আছে। চেতনা-প্রবাহে সংলগ্ন-অসংলগ্ন impression-এর মালা গাঁথা হয়, কিন্তু এতে থাকে না কোনো সুডোল যুক্তিসঙ্গত উপসংহার অথবা জিজ্ঞাসা। যে impression-গুলো ঘটেছে কোন অভিপ্রায়ের দিকে তারা চলেছে বোঝবার উপায় নেই—থাকেও না কোনো অভিপ্রায়। পাঠককে দোষ দেওয়া যায় না, যদি পড়তে পড়তে হাই ওঠে, মনে হয় বোরিং।

উইলিয়ম জেমস চেতনার সংজ্ঞা দিয়েছিলেন, তারই সমর্থন এলো মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসে, আবার এরই থেকে জন্ম হল নতুন উপন্যাস-পদ্ধতির, যদিও চেতনা প্রবাহ পদ্ধতির দিক থেকে মনোবিশ্লেষণাত্মক উপন্যাসের প্রকৃতিগত ভেদ কোথায় তা নির্দেশ করেছি। উইলিয়ম জেমসের সমকালে আর-একজন মনোবিজ্ঞানীর কথা উল্লেখ করেছি যিনি অবচেতন মনের প্রবর্তনাকে স্বীকার করে নেওয়ায় মনোবিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা আরও গুরুতর হয়ে উঠেছিল। তেমনি আর-এক মনোবিজ্ঞানীর চিন্তাও চেতনপ্রবাহ পদ্ধতিকে কম শক্তিশালী করেনি। ইয়ুং মনস্তত্ত্বে দেখিয়েছিলেন মুক্ত সম্ভাবনার (free association) লীলা। জয়েস জুরিখে ছিলেন যখন ইয়ুং এই নিয়ে কাজ করছেন।

সব শেষে প্রশ্ন থেকে যায়। প্রশ্নটা গুরুতর। চেতনাপ্রবাহ পদ্ধতির আর্টটা কোথায়? এর সঙ্গে খবরের কাগজের বিবরণের পার্থক্যই বা থাকল কোথায়? শুধু ইমপ্রেশন লিখে গেলেই কি উপন্যাসের ফরম এসে যায়? সাহিত্যে উপন্যাসের শিল্পরূপ অনেকটাই স্থিতিস্থাপক। তার উপর এতে যদি আর কোনো অনুশাসন না থাকে ;তবে উপন্যাস সার্থক হবে কিসে? অবশ্য প্রথাগত অর্থে এতে প্লট থাকবে না, কিন্তু এব এক একটি মুহূর্ত কাব্যসৌন্দর্যে অপরূপ হয়ে উঠতে পারে, আবার কোনো পূর্বাপরহীন ঘটনা জলের উপর মেঘের ছায়ার মতো রমণীয় হয়ে উঠতে পারে চরিত্রের চেতনপ্রবাহে। সে রকম কোনো সামান্য অকিঞ্চিৎকর ঘটনা চবিত্রটিকে উজ্জ্বল করে তুলতে পারে, বিমর্ষ করতে পারে, জিজ্ঞাসু করতে পারে, তার পূর্বে বিরক্তির সৃষ্টি করতে পারে, তাই দিয়ে চরিত্রের সামগ্রিক রূপটাই ফুটে ওঠে। চেতনাপ্রবাহের আপাতঅসংলগ্নতার ভিতর দিয়ে চরিত্রটি যেন ক্যানভাসের উপর রেখায়িত হয়ে ওঠে। লেখকের ভাষার শক্তির চূড়ান্ত পরীক্ষা হয় এতে। সর্বই যে কাব্যময় অথবা ব্যঞ্জনাগর্ভ হবে তা নয়, সে-ভাষার নাট্যগুণ তো গুণ।

কেউ কেউ বলেন এবং ঠিকই বলেন চেতনায় অভিজ্ঞতার ছবি ফোটাতেও

লেখককে নিশ্চয়ই নির্বাচন করতে হয়। কোন impression-কে ধরে রাখবেন কোনটাকে রাখবেন না, তাতেও একটা বিবেচনা কাজ করবে নিশ্চয়ই। এই নির্বাচনটা হয় ফ্রয়েডিয় পদ্ধতিতে। ফ্রয়েড censor বলে একটা শব্দ ব্যবহার করেছেন সচেতন মনের ধারণা-প্রসঙ্গে।

The censor simply denotes the sum of the urges which prevail in the consciousness of a given individual, in so far as the said urges exercise an inhibitory function upon the urges opposed to them, which they drive back into the unconsciousness. In Freud's view this inhibitory function is only consciously exercised in very early life : it soon becomes automatic, this conscious and repression takes the place of suppression. Not only does the censor consign to the unconscious the urges which oppose it and which have penetrated into unconsciousness, but its inhibitory power is exercised even before their entry into consciousness.

Psychoanalytical Method and the Doctrine of Freud—by Ronald Dalbeiz, 1941, p 53.

মানুষের চেতনা কিছু ইচ্ছাকে দমন করে, কিছু প্রকাশ করে। চেতনার এই প্রকৃতি দিয়েই চরিত্র। এবং এই ক্রিয়াটা রূপে ফুটিয়ে তোলা উপন্যাস রচনার আর্ট। চেতনাপ্রবাহ পদ্ধতির উপন্যাসে অনেক অসংলগ্ন ছবি ফুটে ওঠে, আপাত-দৃষ্টিতে উপন্যাস-কাহিনীর সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই। কিন্তু অবচেতন মনের প্রতিভাস হিসাবে এর মূল্য এবং চেতন অবচেতন মন মিলিয়েই আজকের উপন্যাসের চরিত্র। পূর্বতনকালে চরিত্র হত প্রবৃত্তি, মানসিক প্রবণতা, সচেতন অনুভূতি তার বাসনা প্রেম ভালোবাসা দ্বিধা দিয়ে। তারই বিশ্লেষণ করতেন লেখক। এ-উপন্যাসে চরিত্র তৈরি হয় প্রবৃত্তি নয় চেতনার প্রতিভাস দিয়ে। শব্দের রঙ আর রেখা দিয়ে লেখক রচনা করেন নতুন উপন্যাসের চরিত্র। প্লটের তো কোনো গুরুত্ব নেই, নেই বিশ্লেষণের।

মননধর্মী সাহিত্য

১৯৩৮-এ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে সমালোচক মোহিতলাল একটি মন্তব্য করেছিলেন:

'মানুষের মন এখন বিশ্লেষণধর্মী হইয়াছে—বহুর যে বৃহৎ ঐক্য তাহাকে না মানিয়া খণ্ডকে বহুধা-বিভক্ত করিয়া ঐক্যের অভাবটাকে ঘোষণা করিতে চায়। মন তাহাতেই নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে। আদি ও অন্তের ভাবনা করিতে হয় না। চলমান জগৎ-যাত্রার ক্ষণিক ও বিচ্ছিন্ন চিত্রগুলি হইতেই একটু রস আস্বাদন করিয়া তৃপ্ত হয়। ইহাই অতি আধুনিক বিংশ শতাব্দীর মানবীয় প্রবৃত্তি।'

মোহিতলালের বক্তব্য এই যে বস্তুবিশ্বকে খণ্ড খণ্ড করে তত্ত্ব নির্ধারণ করবার চেষ্টায় প্রাণের সহজ অনুভূতিকে গৌণ করে ফেলা হয়েছে। এজন্য আজকের সাহিত্যে আমরা মার্কস-এর অর্থনৈতিক তত্ত্ব ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব ছাড়াও রাজনৈতিক মতবাদ দিয়ে জীবন ও চরিত্রকেই শিল্পিত করতে যাই ; শিল্পী-মনের অনুভূতি-মাত্রকেই কোনো বুদ্ধিগত অনুশাসনের বশবর্তী করে নিই। আজকের সাহিত্য আর সহজ বিশ্বাস, সরল উপলব্ধি, অকুণ্ঠ অনুভূতির সাহিত্য নয়।

মোহিতলালের এই বক্তব্যের মধ্যে সারবত্তা আছে ; কিন্তু বিংশশতাব্দীর সাহিত্যের প্রবৃত্তি বিশ্লেষণধর্মিতা হলেও সাহিত্যকে মনন-চেতনা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় কিনা সন্দেহ। পূর্বতন সাহিত্যে যে কেবল প্রাণময় অনুভূতি আছে, মনন তার পটভূমিতে নেই—এ-কথা সত্যই বলা যায় না। একেবারে প্রাচীনকালে মানুষ যে-কবিতা রচনা করেছে, তার প্রকৃতি একালের সাহিত্যের প্রকৃতি থেকে আলাদা। পার্থক্যের প্রধান কারণ কেবল বিষয়বস্তুই নয়—কবিচিত্তের বিশিষ্ট ভঙ্গিও। গ্রীক নাট্যকার ও মহাকবি তাঁদের পুরাণ-কথা থেকে কাহিনীর উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন, তেমনি রামায়ণ-মহাভারত-রঘুবংশ-শকুন্তলার বিষয়ও সংগৃহীত হয়েছিল লোকগাথা, বেদ অথবা পুরাণ থেকে। কিন্তু শুধু বিষয়-গুণেই তারা প্রাচীন নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'রক্তকরবী' নাটকের কাহিনীর সঙ্গে রামায়ণ-কাহিনীর মিলের উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু আজকের পাঠকরা জানেন রক্তকরবীর কাহিনীগত মিলের দিকে কবি যতই অঙ্গুলি নির্দেশ করুন, রক্তকরবীতে একটি আধুনিক তত্ত্ব আছে। রামায়ণে তত্ত্ব নেই কিন্তু মননও নেই, একথা কি বলা যায়? রাবণ যে অশুভ শক্তির প্রতীক, শুভশক্তির দ্বারা তাকে নির্জিত দেখানো কিংবা শুভ ও অশুভ যে একই নিয়মের দু-দিক, এ-যে সেই মহানিয়মেরই লীলা—এ সব ঋষিকবির মননধর্মেরই ফল। গ্রীকনাটকে যে-নিয়তি এবং দৈবনিয়মের অমোঘতা দেখি তা-ও সেকালের কবির চিন্তারই শিল্পময় অভিব্যক্তি।

তবে একে মনন বলব না জীবনের বিশুদ্ধ চিন্তাহীন অনুভূতি বলব তাই নিয়ে

তর্ক উঠতে পারে। গ্রীক সাহিত্যে চিন্তার স্থান বিশেষ নেই, অনুভূতিই আসল। তারই নাম হেলেনিজ্‌ম। অতএব গ্রীক সাহিত্যে যে জীবন-চেতনাকে পাই তাকে মননজাত তত্ত্ব না বলে ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভূতি বলাই উচিত। এ কথা সত্য বটে তথাপি যে-অনুভূতি একটি দৃঢ় বিশ্বাস এবং জাতিগত সংস্কারে রূপ নেয় তার একটা নৈর্ব্যক্তিক সামাজিক ভিত্তি আছে বলেই তাকে কেবল মননহীন অনুভূতিমাত্র বলা যায় না। হয়তো এর শাস্ত্র-পুথিগত অনুশাসন কিংবা যুক্তিনির্ভরতা নেই, কিন্তু যা ঐক্য দেয়, অর্থবান করে, সঙ্গতি রচনা করে তার মূলে মননধর্ম থাকেই। কখনও সে মননধর্ম সুস্পষ্টরূপে উচ্চারিত, কখনও অপেক্ষাকৃত প্রচ্ছন্ন। যখন আমরা একটি সুসম্বদ্ধ অর্থবান কাব্য পড়ি, তখন আমরা কেবল যে অনুভবমাত্রই করি তা নয়, আমাদের চিন্তায় জীবনের একটা সমগ্র রূপ যুক্তিসঙ্গত হয়ে ওঠে। রামায়ণের কাহিনীতে আমরা ভারতীয় জীবনধর্মের একটা আদর্শই পাই। রামায়ণ মহাকাব্যখানা পড়লে আমরা সে-জীবনকে উপলব্ধি করি। তা না হলে বিচ্ছিন্ন বিপরীত অসংলগ্নতা আমাদের মনে খণ্ড খণ্ড ভাবে রসের সৃষ্টি হয়তো করত কিন্তু সমগ্র অর্থ নিয়ে আসত না।

সাহিত্যে মননধর্ম কথাটার আর একটা অর্থ আছে। কবি কখনো কখনো সম্পূর্ণ স্বকীয় ব্যক্তি-চিন্তার দ্বারা বিষয়কে বিন্যস্ত করেন। যে-অর্থ তিনি ফুটিয়ে তুলতে চান, সে-অর্থ তাঁরই মানসিক ক্রিয়ার ফল, সে-বক্তব্য তাঁরই ; পাঠককে তিনি তাঁর বক্তব্যে অনুপ্রেরিত করতে চান। আজকের নাটকে উপন্যাসে কাব্যে লেখকের বক্তব্যকে বেশ সরব হয়েই উঠতে দেখি। লেখকের চিন্তাকে স্পষ্ট করবার জন্য বিষয়কে বাস্তবানুগ না করে বিশেষ রীতিতে সাজানো হয়। এই মননধর্মকে একালেরই বৈশিষ্ট্য বলতে পারি। প্রাচীন সাহিত্যকলার সঙ্গে এই সাহিত্যের পার্থক্য এখানে। যাকে ক্লাসিক্যাল এবং রোমান্টিক বলে তার সঙ্গেও এই বিভিন্নতার সম্পর্ক আছে। হারবার্ট রীডের অভিমত— Romanticism is the expression of personal values, classicism the expression of universal values.

একটি ব্যক্তিগত, আর একটি বিশ্বগত কিন্তু দুই-ই 'ভ্যালু' অর্থাৎ চিন্তা। ক্লাসিক্যাল সাহিত্যে এই চিন্তা সমগ্র সমাজ-মানসের, কবি-চেতনার মধ্যবর্তিতায় সে শিল্পরূপ লাভ করে ; রোমান্টিক সাহিত্যে এই চিন্তা লেখকেরই সুতরাং সেই চিন্তাকে রূপ দিতে গিয়ে প্রচলিত 'ফর্ম'কে তিনি ইচ্ছা করেই লঙ্ঘন করে যান। ক্লাসিসিজ্‌ম-রোমান্টিসিজ্‌মের বহুধা বিস্তীর্ণ লক্ষণের মধ্যে এটি অন্যতম লক্ষণ। এই লক্ষণের দ্বারা আমরা একটি বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে পারি : ব্যক্তিগতই হোক আর নৈর্ব্যক্তিকই হোক, দুয়েরই মূলে আছে মননধর্মিতা। মননধর্মের দুই প্রকাশভঙ্গিমার নামান্তর অবজেকটিভিটি এবং সাবজেকটিভিটি। প্রাচীন কাব্যের লক্ষণ নৈর্ব্যক্তিক বস্তুনিষ্ঠা। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় এটাই স্বাভাবিক। কারণ সাহিত্য যখন সমগ্র সমাজ-মানস থেকে উদ্ভূত, তখন কবিব্যক্তিও আলাদা

নয়। সেকালের গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজেরই এই সৃষ্টি। মহাভারত কাব্যখানা সম্পর্কে ব্যাসদেবের নিরাসক্ততার দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়ে থাকে। এই কাব্যটির মধ্যে এত বিচিত্র বিভিন্ন চরিত্রের সমাবেশ হয়েছে এবং চরিত্রগুলির মধ্যেও এমন অপূর্ব ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়েছে যে এই কাব্যটিকে অবজেকটিভিটির চমৎকার দৃষ্টান্ত হিসাবে নেওয়া যায় অনায়াসেই। অথচ মহাভারতের পশ্চাৎপটে কী নেই? ধর্ম, নীতি, তথ্য, তত্ত্ব। তার কোনোটাই বোধহয় আকস্মিক বা অপ্রচলিত নয়। সর্বোপরি তার মূল কথাটি এই :

সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদি বা প্রিয়ম্।
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতঃ॥

শেকসপীয়রের ভাষায় বলতে গেলে We must endure our going hence even as our coming hither. Ripeness is all. এই মনোভাব স্বভাব-বৈরাগ্যের ফল এ কথা বলাই যথেষ্ট নয়। কিংবা একে জড়চিত্তের চিন্তা বলাও যাবে না। এ-চিন্তা যার জীবনের, অনেক কঠিন আঘাত, অনেক মোহ-ভ্রংশ অনেক দুঃখবরণ ও বেদনা দিয়ে তার হৃদয়টি নির্মিত। অনেক মানুষ, অনেক ঘটনার সে সাক্ষী, অনেক পাপ-পুণ্য সুখ-দুঃখের সে শিল্পী। গ্রীক নাটকে ঘটনার পরিণাম থেকে যে জীবন-চিন্তার আভাস অনুভব করি, শেকসপীয়রের নাটকের সঙ্গে তার মিল আছে কিনা, পণ্ডিতেরা তার বিচার করবেন। ব্র্যাডলি তো বলেন শেকসপীয়রের জগৎ নীতিরই জগৎ কারণ পাপের প্রতিক্রিয়াতেই সে-জগতের ভারসাম্য বিচলিত হয়। এ নিয়ে তর্ক করে কোনো সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো শক্ত। কিন্তু আমরা অন্য দিক দিয়ে দেখতে পারি, শেকসপীয়রের প্রতি নাটকের ঘটনাধারায় এবং চরিত্রভাগ্যে একটি যুক্তি শৃঙ্খলা বা প্ল্যান আছে। তাঁর নাট্যজগৎ বিশৃঙ্খলার জগৎ নয়। প্রতি ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সুষ্ঠু কার্যকারণ আছে বলেই শেকসপীয়রের জীবন-চেতনা পূর্ণাঙ্গ ঐক্যবদ্ধ। তাঁর নাট্যকলা নৈর্ব্যক্তিক নিরাসক্ত চেতনার সৃষ্টি সত্য, কিন্তু প্রকৃতির শক্তিগুলির নিপুণ বিন্যাসের দ্বারাই তাঁর মননের দৃঢ়তা সুপ্রমাণিত।

এই শৃঙ্খলাই যে-কোনো সাহিত্যসৃষ্টিকে মহিমাময়, সুগঠিত, গভীর এবং স্থায়ী করে। সাহিত্যে এই ভিত্তিটি থাকাই চাই। এ না হলে..কোনো সাহিত্যই সুন্দর হয় না, বলিষ্ঠ হয় না। রূপের সুডোলতা শিল্পী মাত্রেরই কাম্য। মনন দেয় সেই আকার।

ডি কুইন্সী সাহিত্যের যে দুটি ভাগ করেছিলেন সে-দুটি ভাগ সকলেই জানেন। তিনি বলেছিলেন জ্ঞানের সাহিত্য আর ভাবের সাহিত্যের কথা। পাঠকেরা একবাক্যে মেনে নিয়েছেন, ওই দ্বিতীয়টাই সৃষ্টিমূলক সাহিত্য অর্থাৎ বিশুদ্ধ সাহিত্য। প্রথমটি তথ্য বা তত্ত্বের সাহিত্য। তার কাজ আমাদের যুক্তি চিন্তা ও মননকে সমৃদ্ধ করা। প্রবন্ধ জাতীয় এই সব রচনাই মনন-ধর্মী, এ-কথা সত্য বলে স্বীকার্য হলেও অন্য জাতীয় রচনামূলেও মনের বা চিন্তার বাঁধন থাকে সেটাই আমাদের বর্তমান বক্তব্য। অবশ্য প্রবন্ধ জাতীয় রচনাকে সাহিত্যের নিম্নতর স্তরে

স্থান দেবার যুক্তি কতখানি সে বিষয়েও সন্দেহ করি। কেননা এ রচনাও তথ্য ও তত্ত্বের গুরুত্ব রক্ষা করেও সাহিত্য-পদ পেতে পারে লেখকের সৃষ্টিধর্মী ব্যক্তিত্বের গুণে। রচনায় লেখক আপন মনের প্রতিফলন যদি ঘটাতে পারেন, যদি বক্তব্যকে এমন ভাষাভঙ্গিমায় উপস্থাপিত করতে পারেন যাতে আমরা তার মধ্যেই লেখকের নিবিড় ব্যক্তিত্বকে পাই তবে সেই প্রবন্ধকে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের সঙ্গে স্থান দিতে ক্ষতি কি? অবশ্য সাধারণত আমরা গদ্যরচনার সেই শ্রেণীকেই সাহিত্যরূপে বিবেচ্য করে দেখতে অভ্যস্ত যে-শ্রেণীটি নিছক কল্পনামূলক, রম্য, ব্যক্তিগত ভঙ্গিমায় রচিত। মনটেন থেকে একালে হ্যাজলিট, ল্যাম, চেষ্টারটন বেলক, ম্যাক্সবীয়রবোম এবং আমাদের বিচিত্র প্রবন্ধের রবীন্দ্রনাথ, বীরবল, বুদ্ধদেব বসু প্রভৃতির বিশেষ একশ্রেণীর রম্যরচনাকেই সাহিত্যশ্রেণীতে গণ্য করে থাকি। কিন্তু ইংরেজী সাহিত্যে চার্চিলের বা রাসেলের লেখা তথ্যাশ্রয়ী বলেই কি সাহিত্য-অভিধা থেকে বঞ্চিত হবে? বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ রামেন্দ্রসুন্দরের রচনা কি সেদিক থেকে আমরা মেনে নেব না? এই রচনার মধ্যে কল্পনার স্থান অকিঞ্চিৎকর। এর সবটা রচনাই মনন বা বুদ্ধিজাত। কিন্তু সে-বুদ্ধি মানববুদ্ধি, যে-মানুষ নিজেকে অতিক্রম করে নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্বের জাল রচনা করে। এর যে প্রকাশ তার মহত্ত্ব তো কোন দিক দিয়ে কম হবার নয়।

আসলে মানুষের যা কিছু সত্যকার প্রয়াস, তার থেকে মননকে কখনই সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। কল্পনার সৃষ্টি নাটক কাব্য। তাদের সমালোচনা যখন করতে বসি তখন বুদ্ধি দিয়েই করি। সাহিত্যের কল্পনাভঙ্গিকে যুক্তিবদ্ধ করে দেখাই। হয়তো তার মধ্যে অনেকখানি থাকে যা লেখকের অভিপ্রেত ছিল না। সমালোচক তার নিজের বিচারবোধ দিয়েই তার বিশ্লেষণ করলেন। তাই নিয়ে বিভিন্ন সমালোচকের মধ্যে তর্ক বিতর্কও হয়ে থাকে। এর যুক্তিযুক্ততার কথা যাক। এটাই প্রাসঙ্গিক যে, সমালোচক মূল লেখকের রচনার যুক্তি খুঁজে দেখবার চেষ্টা করে থাকেন। তাতেই প্রকারান্তরে প্রমাণিত হয় যে, যাকে বলি ক্রিয়েটিভ লেখা তার মূলেও মননধর্ম কাজ করে নিশ্চয়ই। অতএব মননের ভূমিকা গূঢ় গভীর সর্ব্বব্যাপী। উপনিষদে বলা হয়েছিল মেধার দ্বারা লভ্য নন যিনি, তিনি মনন এবং নিদিধ্যাসন দ্বারাই অর্জিত হন। যে-সাহিত্য নৈর্ব্যক্তিক অবজেকটিভ তার মর্মে আছে যেমন মননশক্তি, যে-সাহিত্য কল্পনামূলক ব্যক্তিগত ভঙ্গিমায় রচিত তারও মর্মে আছে মননশক্তি। আবার চিন্তাবস্তুকেই মুখ্যত প্রাধান্য দিয়ে লেখা তথ্য ও তত্ত্বমূলক রচনাও মননধর্মী তো বটেই। ভাবের সাহিত্য জ্ঞানের সাহিত্য—দুই ভাগই থাক। এই বিভাগের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার্য নয় কিছুতেই ; কিন্তু জ্ঞানের সাহিত্যকে উচ্চতর সাহিত্যিক গৌরবে বঞ্চিত করাও ঠিক হবে না।

এ কথা সত্য মনন-সাহিত্যের যে-রূপটি আমরা আজ দেখছি, তার সূত্রপাত কয়েক শ বছর আগে। য়ুরোপে রেনাশাঁসের সময়ে আধুনিক চিন্তাপদ্ধতির সৃষ্টি।

মধ্যযুগের চিন্তা ছিল বিশ্বাস-নির্ভর। ধর্মচেতনাকে প্রমাণিত করবার জন্য চিন্তাশক্তির প্রয়োগ। আমাদের দেশেও তাই। পূর্বতন কালে ঋষিবচনে সে-সত্য নিহিত ছিল তাকে দার্শনিক প্রস্থানে যুক্তি-আশ্রয়ী করে দেখানো ছিল সেকালের মননক্রিয়া। ন্যায়ে সে-বুদ্ধি কাজ করেছে, বিস্ময়কর তার তীক্ষ্ণতা, কিন্তু সে-বুদ্ধি বস্তুসত্যহীন আকাশচারী। জীবনের সঙ্গে তার যোগ নেই। মানবিক সমস্যা নিয়ে তার ব্যবহার নেই। ভারতবর্ষেও তা পূর্বতন শাস্ত্রবচন অবলম্বনেই অগ্রসর হয়েছে। জীবনের অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করেনি। এর নাম স্কলাসটিসিজম্।

মনন-সাহিত্যের অভিনব বিকাশ হয়েছে যখন মানব-অভিজ্ঞতাকে আর অস্বীকার বা উপেক্ষা করা গেল না। বস্তুজগতের পর্যবেক্ষণ বিশ্লেষণ এবং তার থেকে নিয়ম উদ্ধার—আধুনিক মননক্রিয়ার এটাই হল সবচেয়ে বড় কাজ। এক কথায় জীবনের অর্থ সন্ধান, উন্নয়নিচিন্তা, অতীতের সন্ধান, ভবিষ্যতের কর্তব্য, ইতিহাস, সমাজনীতি, বিজ্ঞান—এ-সব হল এর অন্তর্ভুক্ত। আধুনিক যুগে তাই প্রবন্ধ-সাহিত্যের বিস্তার। লক হিউমের জ্ঞানতত্ত্ব, গীবন মেকলের ইতিহাস, স্পেনসার মিলের সমাজতত্ত্ব, ইত্যাদি সমাজ-জীবন সম্পর্কিত বহু বিষয়ের মননধর্মী প্রবন্ধের এক বিপুল সাহিত্য গড়ে উঠল। বিভিন্ন বিজ্ঞানের অনুসন্ধানের থেকে প্রাপ্ত ফল একত্র মিলিয়েই ড্রেপার তাঁর অসাধারণ বই লিখেছিলেন A History of the Intellectual Development of Europe. উনিশ শতকে লেখা সেই বইতে তখন আধুনিকতর চিন্তাকে নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। কিন্তু দুই ভলুমে লেখা ওই বই প্রমাণ করে একালের চিন্তাপদ্ধতি কোন পথে অগ্রসর হয়েছে। বেকন সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন:

Few scientific pretenders have made more mistakes than Lord Bacon. He rejected the Copernican system and spoke insolently of its great author ; he undertook to criticise adversely Gilbert's treaties 'De Magnete' ; he was occupied in the condemnation of any investigation of final causes, while Harvey was deducing the circulation of the blood from Aquspendente's discovery of the valves in the veins ; he was doubtful whether instruments were of any advantage, while Galileo was investigating the heavens with the telescope. Ignorant himself of every branch of Mathematics, he presumed that they were useless in science but a few years before Newton achieved by their aid his immortal discoveries. It is time that the sacred name of philosophy should be severed from its long connexion with that of one who was a pretender in science, a time-serving politician, an insidious lawyer, a corrupt judge, a trecherous friend, a bad man.

কিন্তু বেকনের নাম দর্শনের ইতিহাস থেকে মুছে যায়নি ; যুক্তিবাদকে তিনি যে-প্রতিষ্ঠা দিয়ে গিয়েছেন তার তাৎপর্য অতি গভীর। উনিশ শতকের এক বাঙালি কবি সমকালীন এক মননশীল লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত সম্বন্ধে রসিকতা করে

লিখেছিলেন 'বেকন পড়িয়া করে বেদের সিদ্ধান্ত।' আর কিছু না হোক আধুনিক মননভঙ্গির সঙ্গে বেকনের প্রভাব কতখানি জড়িয়ে গিয়েছে, এতেই বোঝা যায়। আমাদের মনন-সাহিত্যও এই ঔৎসুক্য ও জীবনানুসন্ধিৎসা নিয়েই তৈরি হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে অক্ষয়কুমার দত্তের রচনা থেকেই চিন্তাভঙ্গি স্পষ্ট রূপ নিয়েছে। তিনি জীবনকেই ধ্যানযোগ্য বলে মনে করেছেন ঈশ্বরকে নয়। এই জীবন কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা চালিত। তাই প্রাকৃতিক নিয়মকে নানা বিজ্ঞান ও আধুনিক শাস্ত্রের ভিতর দিয়ে জানতে হবে। এই প্রত্যক্ষতাবাদ ছিল অক্ষয়কুমারের বৈশিষ্ট্য। বঙ্কিমচন্দ্রেরও তাই। তবে বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যক্ষতাবাদ ও ঈশ্বরতত্ত্ব দুয়ের মিলন ঘটাতে চেয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় চারিত্র্য-নীতি বস্তুত তাঁর উপন্যাসকে মননধর্মী করে তুলেছে। আমি অবশ্য একে নিছক সমাজ-সংস্কারের নীতি বলে মনে করি না। এ আরো গভীরতার দ্বন্দ্ব, বিবেক-প্রবৃত্তি শুভ ও অশুভের। বঙ্কিমচন্দ্রের মনন প্রবন্ধ সমাজ ইতিহাস দর্শন নিয়ে লেখা বটে, কিন্তু তাঁর মনে তাঁর কালের য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক নিয়ম-বিন্যস্ত জীবন-চেতনারই প্রভাব। শুধু বঙ্কিম কেন সেকালের সাধারণ মনোভাব ছিল এর দ্বারাই আচ্ছন্ন। কিন্তু এই নিয়ে গোঁড়ামি করা হয় তো উচিত নয়। কেশব সেনের ভক্তিবাদও তো ছিল।

এই পরিচ্ছেদের গোড়াতেই মনন-প্রবন্ধকে সাহিত্যের উচ্চতর আসনে অধিকার দেবার প্রয়োজনের উল্লেখ করেছি। তারই সূত্র ধরে বলব, উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ এই বিভাগটিকে যদি আলাদাভাবে পর্যালোচনা করা যায়, তবে আমরা যে কেবল কিছু তথ্য ও জ্ঞান আহরণ করব তা নয়, এর থেকে বাঙালি মনের বিশিষ্ট চিন্তাপ্রকৃতির সন্ধানও পাব। কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমরা অবহিত হতে পারি। সেকালে প্রবন্ধ কেবল বিশেষজ্ঞের বিষয়মাত্র ছিল না। মনীষী লেখকের আলোচনার বিষয় ছিল বিচিত্র এবং সে-আলোচনা হত যথেষ্ট তথ্যনির্ভর এবং জ্ঞানগর্ভ অর্থাৎ সেকালের মনীষা বিভিন্ন ক্ষেত্রেই পর্যটন করত, তখনকার পত্রিকায় ইতিহাস-বিজ্ঞান-দর্শন-নীতি নিয়ে প্রকৃত পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখা বেরিয়েছে। আজকালকার মাসিকপত্রে এই বিশেষত্ব দেখা যায় না। এখনকার দিনে রাজনীতি বা রাজনীতি-গন্ধী সাময়িক উপলক্ষাশ্রয়ী রচনারই প্রাচুর্য। তা ছাড়া বিশ্বতোমুখী সংবাদ-সংগ্রহের দিকে ঝোঁকও সহজলক্ষ্য। পরিবেশনের প্রণালীতেও বিশেষত্ব আছে। পাঠকদের কাছে সহজগ্রাহ্য করবার জন্য ভাষাকে গাম্ভীর্য-মুক্ত করতে রম্যতাধর্মের প্রতি অধিকতর মনোযোগ। আজকাল প্রবন্ধের ভাষা যে যথেষ্ট লঘু সহজ এবং গতিশীল হয়েছে সে কথা স্বীকার করতেই হবে।

উনিশ শতকের প্রবন্ধের সঙ্গে বিশ শতকের প্রবন্ধের একটা মস্ত পার্থক্য ঘটে গিয়েছে চিন্তায় ভঙ্গিতে এবং ভাষায়। বিশ শতকের গোড়া থেকেই নতুন পাশ্চাত্য চিন্তাভঙ্গি আমাদের লেখকদের মনোজগৎ অধিকার করেছে। ফ্রয়েড মার্কস ইবসেন শ রাসেল—এদের সংস্কারমুক্ত মানবকেন্দ্রিক বিশ্লেষণ চিন্তা আমাদের আচ্ছন্ন করল। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবিক দৃষ্টি আরটিস্টিক ললিত ভাষার দ্বারা

সহজেই গদ্য লেখকদের প্রভাবিত করল, প্রমথ চৌধুরীর বাক্‌চাতুর্য কনভেনশন-বিরোধী বক্তব্যকেও ছাড়িয়ে গেল। তাছাড়া গান্ধী-সুভাষ-মানবেন্দ্রনাথের সমাজ-তান্ত্রিক চিন্তা আমাদের মানব ইতিহাসকে নতুনতর কেন্দ্রে লগ্ন করল। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি মনের পট পরিবর্তন হল।

আমরা যাকে মননধর্মী সাহিত্য বলেছি অর্থাৎ সেই কল্পনাশ্রয়ী সাহিত্য যার মূলে মননের দৃঢ় ভিত্তি থাকবেই, আমাদের বাংলা সাহিত্যে তার কী প্রকৃতি দেখতে পাচ্ছি? উনিশ শতকের দুই শক্তিশালী লেখক মধুসূদন দত্ত এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। মধুসূদন এমন বিষয় উপকরণ বেছে নিয়েছিলেন যার সঙ্গে তাঁর কালের কোনো নীতি জড়িত না থাকারই কথা। মেঘনাদবধ কাব্য বা বীরাঙ্গনা প্রাচীন কাহিনী নিয়ে লেখা। স্বভাবতই এদের মধ্যে মধ্য উনিশের সামাজিক নীতি চরিত্র-তত্ত্ব কিংবা সে-সম্বন্ধে কবির নৈতিক অনুশাসন স্থূল রূপ নিয়ে আসেনি। যদি এসে থাকে তবে রূপকের আবরণে, ইঙ্গিতে ব্যঞ্জনায়। কিন্তু রাবণ-ই হোক আর বীরাঙ্গনার নায়িকারাই হোক— তারা তো পাঠকের কাছে তত্ত্বরূপে আসেনি, এসেছে বেদনাহত চিরন্তন মানুষেরই বেশে, প্রেম-বিরহ হিংসা-স্নেহ ক্ষোভ জ্বালা তৃপ্তি নিয়েই। সাহিত্যে চিরকালই তাই হয় ক্লাসিকেল সাহিত্যে, শেক্সপীয়রের নাটকে। এই সাহিত্যের মর্মে একটা বুদ্ধিগত উপলব্ধি থাকলেও জীবন-ধারাকে জীবনেরই প্রেরণায় চালিত গঠিত ও স্বভাবানুগামী রূপেই আঁকা হয়। এর মানুষ ব্যক্তিমানুষ, এর ঘটনা দৈব অথবা পুরুষকার-নির্ধারিত। মধুসূদনের সৃষ্ট চরিত্র বা ঘটনা জীবনের স্বাভাবিক পরিণাম থেকে স্খলিত হয়নি। এ কথাও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্বন্ধে একবাক্যে বলা হয় তো যাবে না। কুন্দের বিষপান, রোহিণীর মৃত্যু, শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত—এ-সব সর্বাংশে স্বাভাবিক হয়েছে কিনা এ নিয়ে চিরকালই বিতর্ক হয়েছে। যেখানে স্বাভাবিকতা থেকে বিচ্যুত হয়েছে, সেখানে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনতত্ত্বই দায়ী অর্থাৎ সেখানেই বঙ্কিমের নিজস্ব মননক্রিয়া জীবনানুভূতিকে আচ্ছন্ন করেছে। এই অভিযোগের মূলে সত্য যাই থাক একথা অবশ্যস্বীকার্য যে তাঁর উপন্যাসের ঘটনা-কাহিনী-চরিত্র সবই দেহজীবনেরই স্পন্দনে স্পন্দিত। তাদের সমস্যা প্রেম-বিরহ-ঘটনা-কাহিনী-চরিত্র সবই দেহ-জীবনেরই, তাদের সমস্যা প্রেম-বিরহ-ঈর্ষা থেকেই উদ্ভূত সমস্যা—সেই চিরন্তন নরনারীর আকর্ষণ বিকর্ষণ। শেক্সপীয়রের নাটকে মানব চরিত্রের অজস্র বৈচিত্র্যে যে-জীবন বিকশিত, বঙ্কিমের শিল্পসৃষ্টিতে তাঁর নিজস্ব তত্ত্ব-চিন্তা কি উগ্র মূর্তি নিয়েছে? সে সমালোচনার মধ্যে যাওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু এটুকু তো বলতে পারি, যে-মননচিন্তা সেকালের বাঙালি মনের বৈশিষ্ট্য বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ থেকে যা বুঝে নিতে কষ্ট হয় না, তাঁর উপন্যাসে তার ছায়াপাত হয়েছে। সেই মিশ্রণ কখনো কখনো এমনভাবেই হয়েছে যে জীবনের ছন্দ তাতে খণ্ডিত হয়েছে বলেই অনেকে মনে করেন। বঙ্কিমের আর একটি উপন্যাস দেবী চৌধুরানী।

অনুশীলন ধর্মের তত্ত্বটিকেই দেবী চৌধুরানীতে মূর্তি পরিগ্রহ করানো হয়েছে। এ-উপন্যাসের ঘটনাগুলিতে বৈশিষ্ট্য আছে। এতে এমন কতকগুলি ঘটনা আছে যাকে ঠিক স্বাভাবিক বলা যায় না, যা তত্ত্বের প্রয়োজনে ঘটেছে। দেবীর অনুশীলন ধর্ম শিক্ষান্তে রানীর পদে অভিষেক আমাদের মধ্যে রোমান্স-রস জাগাতে পারে কিন্তু স্বাভাবিকতার দাবীকে নিরস্তই রাখতে হয়। এই যে তত্ত্ব, এ-তত্ত্ব লেখকের নিজস্ব। লেখকের বক্তব্যকে উত্থাপিত করবার প্রয়োজন ও অধিকার থাকেই, বিশেষ করে উপন্যাসে। ইতিপূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি কেমন করে য়ুরোপীয় রেনাশাঁসের পর থেকেই চিন্তার অবাধ মুক্তি ঘটেছে, জীবনোৎসুক মননশীল ভাবুক ও লেখক ভাবনাকে প্রকাশ করার নানা উপায় খুঁজে চলেছে। মননপূর্ণ প্রবন্ধ তো বটেই সাহিত্যের অন্যান্য শ্রেণীতেও তত্ত্ব ও চিন্তাকে ধরে রাখতে চেয়েছে। উপন্যাসের সৃষ্টি তো বলতে গেলে সেই জন্যই হয়েছে। এতে লেখক নিজস্ব মন্তব্য যেমন করে করবার অবকাশ পান, অন্য বিভাগে তেমন নয়। কিন্তু অন্য বিভাগগুলিও রেহাই পায়নি। নাটকে তো বিশেষ করেই। নাটক ও উপন্যাসকে চিন্তাবাহন করে তুলবার সুবিধা এই যে এতে বক্তব্যকে চাক্ষুষ করে তোলা সম্ভব। গলসওয়ার্দি ইবসেন শ—তাঁরা যত দক্ষতার সঙ্গে এ কাজে সাফল্য অর্জন করেছেন অন্য কেউ তা পারেননি। তাঁদের সৃষ্টি প্রতিভার সঙ্গে মননশক্তির সহযোগিতাই এর কারণ। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিম আমাদের চিত্তজাগরণের যুগেই এসেছেন। এমন যুগে যখন বিশ্লেষণ ও জিজ্ঞাসার প্রবণতা দেখা দিয়েছে, পর্যবেক্ষণ ও আপন আপন মীমাংসা তুলে ধরবার ব্যগ্রতা এবং যুক্তির প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে।

অবশ্য লেখকের বক্তব্য বিষয় সকল যুগে একই থাকে না। বঙ্কিম-যুগের বক্তব্য একালের বক্তব্য নয়। এ কথা সত্য। কিন্তু মননধর্মী উপন্যাস সাহিত্যে সেই বাণীই সাহিত্যকে গভীরতা দেয় যাতে জীবনের রহস্যকে কেবল সামাজিক তাৎপর্যে গণ্ডিবদ্ধ না রেখে মানব-মনের জটিলতায় ছড়িয়ে দেওয়া হল। হার্ডির উপন্যাসে মনস্তত্ত্ব সত্যই সেই পর্যায়ে পৌঁছেছে। রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি, যোগাযোগে জটিল মনস্তত্ত্ব,—শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ চরিত্রহীনে দুর্জ্ঞেয় মানবমন পাঠককে বিশিষ্ট জীবন-সমস্যার মধ্যে নিয়ে যায়। বিশিষ্ট এ জন্যে, এই সমস্যা ওই সব উপন্যাসের নিজস্ব, ইংরেজীতে যাকে বলে particular, typical নয়। অথচ এই বিশিষ্ট সমস্যা মানব জীবন সম্পর্কিত সমগ্র বক্তব্যকে পাঠকমনে উদ্ভাসিত করে দেয়। ওই জীবনতত্ত্বই উপন্যাসের জন্মভূমি রচনা করে। বঙ্কিমের উপন্যাস সজ্ঞান—পরিবেশিত তত্ত্ব যা আছে তার চেয়েও গূঢ়তর তত্ত্ব আছে—জীবনেরই তত্ত্ব। তাঁর সৃষ্টির অনুভূতি-গভীরতার কারণ তো সেখানেই, হার্ডির বা ডস্টয়ভস্কির উপন্যাসের মর্মও সেখানেই।

কিন্তু একালে সাহিত্যের প্রকৃতির পরিবর্তন হয়েছে। বড় সাহিত্যে লেখকের জীবন-মনন থাকে আবার আধুনিকতর সাহিত্যে লেখকের মনন-চিন্তা নানা অবসর

ও সুযোগ খোঁজে নিজের স্বাতন্ত্র্যে আত্মপ্রকাশ করার। এটা স্বাভাবিক। যে-মানুষ সৃষ্টি করে সে-মানুষের চিত্তে ভাবনার ছায়াছবি ফুটে উঠলে সৃষ্টিতে তার দেখা পাওয়াটাই নিয়ম। তা না হলে এখনও চলত পুরাণ-মহাকাব্যের যুগ। তবু এখনও পর্যন্ত সাহিত্যের চরম কথাটি হচ্ছে সৃষ্টি অর্থাৎ বিবরণ নয়, বর্ণনা নয়, নতুন রূপ। এ-রূপ কিসের? জীবনকে যেভাবে তিনি দেখেন তারই রূপ রচনা করেন লেখক। এতকাল তো দেখলাম রক্ত মাংসের জীবনটাই সাহিত্যে রূপ পেয়ে এসেছে। শুধু সে জীবন টিপিক্যাল নয় বিশিষ্ট। সেই বিশিষ্ট ঘটনাটাই লেখকের কল্পনা। এ-কালে এর পরিবর্তন ঘটতে চলেছে। পার্টিকিউলার জীবন নয় টিপিক্যাল জীবনটাই লেখকের কলমে স্থান করে নিচ্ছে। এটাই সম্ভবত আধুনিক প্রবণতা। মননধর্মিতার এটাই নবীনতম রূপ।

রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' পড়তে গিয়েই এ কথাটা মনে আসে। 'চোখের বালি' উপন্যাসের পর ঘরে বাইরে পড়লে এটা মনে না হয়ে পারে না। ঘরে বাইরের নায়ক নিখিলেশ তো রবীন্দ্রনাথের জীবনতত্ত্বেরই প্রতীক। জীবনস্মৃতিতে 'ঘর ও বাহির' নামে যে অধ্যায়টি আছে, তাতে কবির ব্যক্তি ও বিশ্ব, সীমা ও অসীমের আইডিয়ার সূচনাটি পাওয়া যায়। তারপর থেকেই এই তত্ত্বটিকে কবি নানা ভাবে প্রকাশ করে বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের নাটক উপন্যাসে এই আধুনিক মননধর্মী সাহিত্যরূপের দৃষ্টান্ত আমাদের একালের সাম্প্রতিক সাহিত্যের অগ্রবর্তী। রক্তকরবী ব্যক্তি-মানুষেব চরিত্র-নাটক নয়, বিশেষ ঘটনার বিশিষ্ট রূপ নয়। একালের সমাজের সমস্যাকে কবি কতকগুলি প্রতীক ঘটনা ও প্রতীক-চরিত্রে সাজিয়ে দিয়েছেন। রক্তকরবীর দর্শক বা পাঠক এ নাটক আস্বাদন করে একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যাগম্য জীবনতত্ত্বকে শিল্পিত হতে দেখতে পায়। একথা মুক্তধারা সম্বন্ধেও বলা যায়। আবার চার অধ্যায়, শেষের কবিতা সম্বন্ধেও বলা যায়। চার অধ্যায়ের তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ খুঁজলেই পরিষ্কার হয়ে যায়, শেষের কবিতার তত্ত্ব তো রবীন্দ্রকাব্যে সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে।

এই বিশ্লেষণী মননের দিকে আমাদের সাহিত্যেব যে গতি তার একটা সূচনাকালও নির্দেশ করা যায় বোধ হয়। সবুজপত্রের সঙ্গে ব্যাপক চিন্তাপ্রধান সাহিত্যসৃষ্টির যোগ আছে কিনা জানি না, তবে ওই রকম সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথের নিজের সাহিত্য-রচনাপদ্ধতিতে এই পরিবর্তন আসে। ডাকঘর বা অচলায়তন রূপক-নাটক বটে, কিন্তু সে রূপক পরবর্তী রূপক-নাটক থেকে আলাদা প্রকৃতির। আগেরগুলি ধর্মচেতনা নিয়ে লেখা। এই চেতনার প্রকাশ গীতাঞ্জলি খেয়াতে। অজিত চক্রবর্তী এদের আলোচনা প্রসঙ্গে ঈভলিন আণ্ডারহিলের বইয়ের কথা এনেছেন। কিন্তু মুক্তধারা রক্তকরবীব রূপক অন্য রীতির। ঘরে বাইরে চতুরঙ্গ প্রভৃতি উপন্যাস এই সময় থেকেই লেখা। পয়লা নম্বর, তপস্বিনী, ল্যাবরেটারি প্রভৃতি শেষ পর্বের গল্পগুলিও আগেব যুগের গল্পের থেকে আলাদা। একালের গল্পে হৃদয়ের রসশ্যামলিমাব অভাব, তার জায়গায়

কোনো নৈতিক বক্তব্যের প্রতীক-চরিত্র রচনার প্রয়াস। এই বক্তব্যের মধ্যে যে অভূতপূর্ব মুক্ত চিন্তার প্রকাশ আছে তা বিস্ময়কর। এই ধরনের মননাশ্রিত সাহিতসৃষ্টি কী ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে তার দৃষ্টান্ত দিতে সমালোচক মোহিতলালের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করি :

'আনন্দবাজারে রবীন্দ্রনাথের ল্যাবরেটরী চোখে পড়িল।—পড়িয়া এমন একটা শক পাইলাম তাহা বুঝাইয়া বলিবার ক্ষমতা আমার নাই। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রপ্রতিভার শেষ দান অথবা পরিণাম যেন একটা গগনভেদী অট্টহাস্য হইয়া উঠিল। কবি রবীন্দ্রনাথের খেলার ঘর, পড়িবার ঘর, সাধন-কক্ষ, বসন্ত বাটিকা, পূজার ঘর, অধ্যাপনা-গৃহ, নৃত্যশালা, ব্যাধিমন্দির—বাংলা সাহিত্যে এই সকলই দেখিয়াছি, কিন্তু 'ল্যাভেটরী'-ও যে দেখিতে হইবে তাহা কল্পনা করি নাই। এই রচনাটিকে আগাগোড়া অন্য অর্থে লইয়া বিদ্রূপ বা শ্লেষের রচনা বলিয়া সাফাই গাওয়া যাইতে পারে—কিন্তু সে হইবে শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার চেষ্টা।'

—বনফুলকে লিখিত চিঠি, ১৯৪০, মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ পৃ. ১১২।

যে-সময় থেকে রবীন্দ্ররচনারীতিতে নতুন অধ্যায়ের শুরু, সেই সময় থেকেই শরৎচন্দ্রেরও ঔপন্যাসিক রূপে আবির্ভাব। কিন্তু শরৎচন্দ্র যখন 'চোখের বালি'র তীব্র মনস্তত্ত্ব অনুসরণ করে চলেছেন তখন রবীন্দ্রনাথ এগিয়ে গেছেন নতুনতর সাহিত্যরীতিতে। তবু একথা আমাদের সকলেরই সুবিদিত শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে সমাজ-জিজ্ঞাসার এবং বাস্তব-পর্যবেক্ষণের আধুনিক ভঙ্গি উপন্যাসকে নিছক হৃদয়লীলার কাহিনীরূপে না রেখে চিন্তা ও যুক্তিবোধের মাধ্যম রূপেই পরিবর্তিত করে দিয়েছে। কিন্তু 'শেষ প্রশ্ন' ও 'পথের দাবী' বাদ দিলে এ-কথা বলা যাবে না যে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মত সাহিত্যকলার প্রতীকধর্ম আনতে পেরেছেন।

সাহিত্যে প্রতীক-ধর্ম আজ এমনই ব্যাপকতা লাভ করেছে যে নাটক উপন্যাস কবিতা কোনো কিছুই আজ আর এর থেকে মুক্ত নয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি ও তারাশঙ্করের হাসুলিবাঁকের উপকথা পড়তে গেলেও একথা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। হাসুলিবাঁকের উপকথায় ঘটনা আছে চরিত্র আছে আঞ্চলিক সংস্কৃতির পূর্ণ পরিচয় আছে তথাপি সমগ্র কাহিনীর পরিকল্পনাটি যেন নবীন ও পুরাতনের টিপিক্যাল দ্বন্দ্ব-চিত্র হিসাবেই নেওয়া হয়েছে। ওই বটগাছ, ওই মহাসর্প—এ সবই তীক্ষ্ণ প্রতীকের মতো। বটগাছের ভেঙে পড়াটা তো স্পষ্টতই পুরাতনের অন্তর্ধানের রূপক। পদ্মানদীর মাঝিতে রহস্যময় সাঙ্কেতিকতা অসামান্য হয়ে উঠেছে কাহিনীর বিন্যাসে। চতুর্থ দশকে কল্লোলের যুগে নুট হামসুনের গ্রোথ অব দি সয়েল উপন্যাসটির প্রভাব বাংলা সাহিত্যে পড়েছিল। পদ্মানদীর মাঝির মননভঙ্গির সঙ্গে এর কোথায় যেন একটা মিল অনুভব করি। সেই আদিম প্রকৃতি সেই ক্ষুধা হিংসা একটা বিশিষ্ট আঞ্চলিক পরিবেশে অর্থগভীর হয়ে উঠেছে। পদ্মানদীর মাঝিতে নরনারীর হৃদয় ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত। কিন্তু মানিকের পরবর্তী রচনায় চিন্তাগর্ভ কল্পনারই প্রাধান্য। শুধু উপন্যাসে নয় নাটকের

চরিত্র-পরিবর্তনও সন্ধানী পাঠককে কম কৌতুহলী করে না। তবু মনে হয় দ্বিজেন্দ্রলাল-যোগেশ চৌধুরীর নাট্যরীতির থেকে সরে আসতে বাংলা নাটকের দেরি হয়েছে কিছু। রবীন্দ্রনাথের নাটক যে প্রচলিত আদর্শে লেখা নয়, এ কথাও অনেকেই জানেন। এজন্যই এ বিশ্বাস আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল যে রবীন্দ্রনাটক পূর্বাপরবিহীন স্বতন্ত্র। কিন্তু সাম্প্রতিক কালের নাটকরচনা ও অনুসরণ দেখলে মনে হয় না রবীন্দ্রনাটক অনুগামীহীন। খুব সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের শেষ দিকের নাটক থেকেই সাম্প্রতিক বাংলা নাটক অনুপ্রেরণা পায়নি, পেয়েছে ইউরোপীয় আধুনিক নাট্যাদর্শ থেকেই। আবার প্রতীক দ্বারা বিশ্লেষণী সমাজ-চেতনাকে প্রকাশ করার রীতিতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আধুনিক নাটকের মিল। রবীন্দ্রনাথ রক্ষা করেছেন সংস্কৃত সাহিত্য-জগতের পরিবেশ, আধুনিক নাটক ভাষা সংগ্রহ করেছে একাল থেকে।

ম্যালার্মে বলেছিলেন, একটা পুরনো কথা নতুন তাৎপর্য দিয়ে বলতে হয়।— কবিতা আইডিয়া দিয়ে লেখা হয় না, হয় শব্দ দিয়ে। বলা বাহুল্য শব্দ বলতে শুধু ললিত মধুর শ্রুতিরম্য ধ্বনিকে বোঝাচ্ছে না, বোঝায় নতুন চিন্তাকে প্রতীকে প্রকাশ করবার মতো ধ্বনিকে। আজকের কবির সাধনা গদ্য-পদ্যকে মিলিয়ে দেওয়ার। ওদেশে এ-শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই শুরু হয়েছিল সে-চেষ্টা পাউণ্ড এবং এলিয়টের কাব্যকলায়। তাকে ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথ পাউণ্ডের সঙ্গে গোড়ার দিকের বন্ধুত্ব সত্ত্বেও। অবশেষে রবীন্দ্রনাথ কবিতার রূপান্তরকে মেনে নিলেন আধুনিক মনন-কবিদের অগ্রগণ্য সুধীন্দ্রনাথকে স্বীকৃতি দিয়ে। সুধীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

'অর্কেস্ট্রার বিষয়বস্তু তাঁর সুরুচিতে বাধলেও এ-বইয়ে তিনি যেহেতু লেখকের অকপট অভিজ্ঞতা খুঁজে পেয়েছিলেন তাই এর প্রকাশে তাঁর অসম্মতি ছিল না, এবং এই বই বেরোনোর পরে তাঁর মত বদলে যাক বা না যাক মনে আছে পাণ্ডুলিপি পড়ে 'অর্কেস্ট্রা'র পূর্ববর্তী আমার প্রায় সকল কবিতা তাঁর কাছে কৃত্রিম লেগেছিল।'

রবীন্দ্রনাথের নিজের কবিতায় নতুনত্বের স্পর্শ লেগেছিল বলাকার সময় থেকেই। অন্যেরা তখনও রবীন্দ্র অনুসরণেই মগ্ন ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ নিজে কবিতার আবেগের সঙ্গে মেশালেন দার্শনিক তত্ত্বকে, নিরবয়ব চিন্তাকে। আর রবীন্দ্রনাথের পরে যাঁকে আমরা বলি আধুনিক মনোভঙ্গির দূত তিনি মোহিতলাল। আজ আমরাই 'নাগার্জ্জুন' 'প্রেতপুরী' 'বুদ্ধ'-র কবিকে চিন্তাজীর্ণ কবি বলে ঔদাস্য প্রকাশ করি।

সাহিত্যের রূপ ও রূপান্তর

আমরা যখন কলেজের ছাত্র ছিলাম তখন আমাদের সাহিত্যের সংজ্ঞা মুখস্থ করতে হত। সাহিত্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের পার্থক্য কি ইতিহাস বা দর্শনের পার্থক্যই বা কি, এসব বিষয়ে অবহিত থাকতে হত। সাহিত্য একটা নূতন সৃষ্টি প্রকৃতি এবং জগতের মতোই। সাহিত্যজগৎ সৃষ্টির উপাদান শব্দ। শব্দ দিয়ে তৈরি হয় সাহিত্যের মানুষ সমাজ প্রকৃতি। রবীন্দ্রনাথ যে গোরা উপন্যাস লিখে একটি মানব চরিত্র সৃষ্টি করলেন এবং গল্প তৈরি করলেন ; সে চরিত্র বা সেই জগতের সঙ্গে আমাদের এই বস্তুজগতের মিল থাকতে পারে অর্থাৎ গোরার মতো চরিত্র আমাদের এই বস্তুজগতে কোথাও থাকতেও পারে। গোরা যে কলকাতার মানুষ সেই কলকাতাও আমাদের এই কলকাতার মতোই কিন্তু সে একটা নতুন সৃষ্টি অবশ্যই। কথা দিয়ে বাক্য দিয়ে, শব্দ দিয়ে এবং কথা ও শব্দের নানা রকম অর্থ সৃষ্টি করে সাহিত্যের একটা নতুন জগৎ তৈরি হয়। এমন জগৎ যিনি তৈরি করতে পারেন, তিনি স্রষ্টা ছাড়া আর কি।

বিজ্ঞান ও দর্শনের সঙ্গে সাহিত্যের পার্থক্য তো এই সৃষ্টি নিয়েই। বিজ্ঞান দিয়ে প্রযুক্তি এবং প্রযুক্তি দিয়ে মানুষের ব্যবহার্য ও ভোগ্য নানা সামগ্রী ও যন্ত্র। একেও তো সৃষ্টি বলতে পারি। আবার দর্শনও রচনা করে নানা তত্ত্ব যে তত্ত্ব আমাদের জানা ছিল না। সুতরাং সেই তত্ত্বও তো এক রকমের সৃষ্টি। কিন্তু সাহিত্যের সৃষ্টি আর বিজ্ঞান দর্শনের সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্যটাও একেবারে মূলগত। সাহিত্যের সৃষ্টি রূপের, বিজ্ঞান দর্শনের সৃষ্টি তত্ত্বের। একটা আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য চেহারা নেয়—পুরোপুরি না হলেও অনেকটাই। গোরাকে আমরা চোখের সামনে যেন দেখতে পাই, লীয়রের কান্না যেন শুনতে পাই, কীটসের কাব্যের verdurous glooms-এর গন্ধ যেন পাই। বিজ্ঞান দর্শনের সৃষ্টি রূপের সৃষ্টি নয়। সাহিত্য আমাদের কাছে রূপের সাক্ষাৎকার ঘটায়। রবীন্দ্রনাথও বলেছিলেন, বিজ্ঞান দর্শন আমাদের অনেক উঁচু ভাবের কথা বলে বটে, কিন্তু সাহিত্যিকের কাছে আমাদের প্রত্যাশা হে গুণি তুমি চিরকালের জন্য কোন রূপটি সৃষ্টি করলে।

'রূপ'—এই শব্দটা কিন্তু বড় সহজ শব্দ নয়। এর নানা রকম মানে হয় নানা প্রসঙ্গে। রূপ বলতে প্রাথমিক ভাবে বুঝি আয়তনযুক্ত কোনো সত্তাকে। শুধু চোখে যে-আয়ত বস্তুকে দেখি তা নয়, কানে যা শুনি, যার গন্ধ পাই, স্পর্শ পাই সবই রূপ। ইন্দ্রিয় দিয়ে যাকে পাই, তাকে সাধারণভাবে বলতে পারি রূপ। কীটসের কবিতাকে, কালিদাসের কাব্যকে এই জন্যই সমালোচকেরা বলে থাকেন রূপময়। শেক্সপীয়রের নাটকের জগৎ রূপেরই জগৎ। তাতে যে মানবচরিত্র আঁকা হয়, তাদের হাসি কান্না, দুঃখ বেদনা সংগ্রাম ও ব্যর্থতা সাফল্য, মত্ততা, প্রতিহিংসা, উচ্চাশা ক্ষুদ্রতা প্রভৃতি আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগতেরই অনুভবের বস্তু। এর

মধ্যে কোনো অবাস্তব বানানো কল্পনার কথা নেই। আমরা সাধারণ মানুষ যেমন করে বাঁচি, যে-দ্বন্দ্ব সংশয়ে আলোড়িত হই, এরাও তেমনি করেই সাহিত্যে বেঁচে আছে। ব্র্যাডলি বলেছিলেন, শেক্সপীয়রের নাটকের নায়করা human to the tip of their fingers. এই সব নিয়েই সাহিত্যে রূপের জগৎ। সাহিত্যের এই রূপরচনার মাপকাঠি আমাদের ইন্দ্রিয়গত বাস্তবচেতনা। প্রকরণগত পার্থক্য থাকলেও উপন্যাস প্রসঙ্গেও এই একই কথা। যে-কবি প্রকৃতির রূপকে পাঠকের চক্ষুকর্ণের কাছে মূর্তিমান করে তুলতে পারেন, তিনি রূপেরই কবি।

সাহিত্যশাস্ত্রে রূপ কথাটির অর্থ ভিন্ন। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক—এরা হচ্ছে সাহিত্যের শ্রেণীরূপ। কবিতার মধ্যে আছে মহাকাব্য গীতিকাব্য। সাহিত্যের আদি অবস্থায় কবিতাই ছিল একমাত্র সৃষ্টি। কবিতার রূপভেদও ছিল, যেমন স্তোত্র কবিতা, শোককবিতা, ভক্তির কবিতা, নীতিকবিতা। এসব নামকরণ বিষয় ধরেই হয়েছে। মহাকাব্য এমন কবিতা যা আকারে বৃহৎ, তার কাহিনীও জটিল। মহাকাব্যকেও আবার দুটি ভাগে দেখানো হয়ে থাকে। কোনো মহাকাব্য একজনের রচনা। একজন কবির রচনা বলেই তার কাহিনী হয়ে থাকে সাজানো গোছানো এবং পরিমিত। কোনো মহাকাব্য কিন্তু এলোমেলো হয়, তাতে বহু কাহিনীর সমাবেশ ঘটবে যা মূল কাহিনীর সঙ্গে অচ্ছেদ্য অনিবার্যতায় বদ্ধ নয়। মহাভারত, ইলিয়ড ওডিসি এই দ্বিতীয় প্রকারের মহাকাব্য। প্রথম প্রকারের মহাকাব্যের দৃষ্টান্ত রঘুবংশ এবং প্যারাডাইস লস্ট, মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য।

নাটকের রূপেরও বদল হয়েছে। গ্রীক নাটকের বা সংস্কৃত নাটকের রূপের সঙ্গে শেক্সপীয়র বা পরবর্তী নাটকের রূপের মিল নেই। কোরাসের ভূমিকা দিয়ে নাট্যদৃশ্যের ভাগের প্রথা বা নান্দী প্রস্তাবনা দিয়ে নাটককে গড়ে তোলার রীতি পরবর্তীকালে থাকেনি। সংস্কৃত নাটকের আরও বহু বৈশিষ্ট্যই পরবর্তী আধুনিক নাট্যরূপে নেই। সেসব খুঁটিনাটি আলোচনার জন্য এই প্রবন্ধ নয়। নাটকের রূপেরও যে কত বৈচিত্র্য আছে, সে-কথাটা মনে করিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট।

গল্প ও উপন্যাস দুই-ই আধুনিক সৃষ্টি। তবে গল্পেরও একটা প্রাচীন রূপ আছে। ঈশপের গল্প বা পঞ্চতন্ত্রের হিতোপদেশের গল্পের সঙ্গে বোকাচিও থেকে পরবর্তীকালের কোনো গল্পেরই মিল নেই। বিষয়বস্তু এবং উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে তো বটেই, গল্পের আকৃতি এবং আয়তনের দিক দিয়েও গল্পরূপের পরিবর্তন হয়েছে। আধুনিক ছোটগল্প এমন বস্তু যা পড়লে তার রসটা পাঠক অনুভব করতে পারেন ঠিকই, কিন্তু তার স্বরূপ নির্দিষ্ট করে বলতে পারা কঠিন। এইজন্য ছোট গল্পের সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনার বিরাম নেই। আজ একথা বোধহয় বলা যায় যে, সব সংজ্ঞার মধ্যেই সত্য আছে, কিন্তু কোনো সংজ্ঞাই ছোটগল্পের বৈচিত্র্যকে সম্পূর্ণ ধরে দিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বৈচিত্র্যকে-ও ধরে দিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পকে কি আদর্শ রীতির ছোটগল্প বলব? তাহলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা সমরেশ বসুর গল্পকে কি সেই মানদণ্ডে আদর্শ বলা

যাবে? কাজ চলার জন্য সব জিনিসের মতো ছোটগল্পকেও হাস্যরসের, করুণ রসের, গোয়েন্দার ইত্যাদি নানা শ্রেণীরূপে চিহ্নিত করা যেতেই পারে। তার কোনোটাই অপ্রয়োজনীয় নয়। ছোটগল্প সাহিত্যের একটি রূপ, সম্ভবত কোনোদিন তার বিলুপ্তি ঘটবে না যদিও মানুষের সাহিত্য সৃষ্টির উন্মেষকালে তার অস্তিত্ব ছিল না।

তবু তো ফেব্‌লে নীতিকথায়, রূপকথায় ছোটগল্পের একটা প্রাচীন রূপ ছিল যা হয়তো মানুষের সাহিত্য সৃষ্টির আদিম উষাকাল থেকেই চলে এসেছে। উপন্যাসের সম্বন্ধে সে কথা বলা যাবে না। এর কোনো প্রাচীন রূপ নেই। উপন্যাস নেহাৎই আধুনিক কালের সৃষ্টি। প্রাচীনকালে মহাকাব্যের মধ্যে কোনো কাহিনীর বিবর্তন দেখানো হত, পরে উপন্যাস খানিকটা সেই কাজ করেছে—এই মাত্র বলা যেতে পারে। আজকাল আর মহাকাব্য লেখা হয় না। বাংলা সাহিত্যে মাত্র কয়েক বছর উপন্যাস ও মহাকাব্য সমান্তরাল ভাবে চললেও মহাকাব্য অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারল না। মহাকাব্য পদ্যে লেখা হয়, উপন্যাস লেখা হয় গদ্যে—দুয়ের পার্থক্য তো শুধু এইটুকুতে নয়, বিষয় অভিপ্রায় লক্ষ্য পরিণাম কোনো দিক দিয়েই এদের মধ্যে পরিপূরকতা নেই। কিন্তু উপন্যাস সাহিত্যের প্রধান জায়গা জুড়ে বসলেও উপন্যাসের রূপও কি একইরকম থেকেছে? বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-রূপের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গের উপন্যাস-রূপের কোনো মিল স্থির করে নেওয়া দুঃসাধ্যই। আবার রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ছোটগল্পের মতো বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস রূপেরও যে বহু বিস্তার ঘটেছে, তাই নিয়ে আলাদা করে প্রবন্ধ বা বই লেখা যেতে পারে।

এদের মধ্যে সাহিত্যরূপ হিসাবে একটি বস্তুই প্রায় দু'হাজার বছর আপন অস্তিত্ব অব্যাহত রেখে এসেছে। সেটি হচ্ছে পদ্য। পদ্য বলতে বোঝায়, নির্দিষ্ট ভাগের ধ্বনির বিন্যাস যা পাঠকের কানে মাধুর্যের সৃষ্টি করে এবং সেই ধ্বনি বিন্যাস দিয়ে রচিত বাক্য। আর সেই ধ্বনিবিন্যাসের নাম ছন্দ। ছন্দ ছাড়াও থাকে মিল, কিন্তু সেটা প্রাচীন পদ্যে আবশ্যিক ছিল না। কিন্তু ছন্দ কবিতায় ছিল আবশ্যিক। মিল সম্বন্ধেও বলা যায়, প্রাচীন গ্রীক কাব্যে বা প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যে মিল না থাকলেও বহুকাল থেকেই মিল রক্ষা করে কবিতারচনা দৃঢ়মূল ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। কাজেই বিশ শতকে যখন কবিতায় মিল উঠে যাবার উপক্রম হল তখন সোরগোল পড়ে গিয়েছিল। এই ছন্দ এবং মিল দিয়েই সাহিত্যে পদ্য নামে একটি শ্রেণীরূপ সুনির্দিষ্ট হয়েছিল। গদ্য তার থেকে আলাদা। তার নির্দিষ্ট ছন্দবিন্যাস নেই, মিলও নেই। গদ্য সম্বন্ধে আরও কিছু কথা বলার আছে। আমরা ছোটগল্প ও উপন্যাসের কথা বলেছি—দুইয়েরই বাহন গদ্য। কিন্তু গদ্যের কাজ এতেই ফুরিয়ে যায় না। গদ্য অবলম্বনে মানুষের মনের আরও কাজ হয়েছে—খুব সাধারণভাবে তাদের সকলকেই সাহিত্যের অন্তর্গত করে দেখা হয়। প্রবন্ধ তো গদ্য ছাড়া হতেই পারে না। অবশ্য প্রবন্ধকে সাহিত্য বলা যাবে কিনা, এ নিয়ে

সংশয় আছে। লেখার গুণে প্রবন্ধ মনোরম হয় এবং তখন তাকে সাহিত্য হিসাবে গণ্য করতেও আপত্তি হয় না। কিন্তু এই প্রবন্ধ কখনো হয় ইতিহাস নিয়ে, কখনো হয় জীবনী নিয়ে, কখনো হয় ভ্রমণকাহিনী নিয়ে কখনো হয় সমাজনীতি, অর্থনীতি বা বিজ্ঞান নিয়ে। এসব বিষয় নিয়ে যখন কোনো সুলেখক লেখেন, তখন তাঁকে অবশ্যই সচেতন থাকতে হয় তথ্য ও বিশ্লেষণ সম্বন্ধে। এগুলি থেকে 'আসল' সাহিত্য যে ভিন্ন সেকথা প্রথমেই বলে নিয়েছি তথাপি প্রথম অর্থে রূপসৃষ্টি না হোক দ্বিতীয় অর্থে এইসব রচনাকেই সাহিত্যের গদ্যরূপবৈচিত্র্য বলে স্বীকার করতে হবে। এ বিষয়ে বর্তমান লেখকের সুনিশ্চিত বিশ্বাস এই যে মানুষের মনের ক্রিয়া বলে এদের সাহিত্যর মধ্যে গণ্য করাই কর্তব্য। এর প্রমাণ বা যুক্তি আছে, সেটি যথাস্থানে উপস্থাপিত হবে।

এবার সাহিত্যে রূপ কথাটির আর একটি অর্থ আলোচনা করব। রোমান্টিক যুগে রূপ, যার ইংরেজি প্রতিশব্দ ফর্ম শব্দটির প্রয়োগ হতে লাগল অন্তরঙ্গ অর্থে। শব্দ ছন্দ বাক্য পদ দিয়ে যে পঙক্তি রচিত হয়ে ভাব প্রকাশ করল, তার বহিরঙ্গ চেহারাটা যেমন এক অর্থে রূপ, বাইরের এই চেহারাটাকে গৌণ করে ভাবের যে চেহারাটা কবির মনে মনে উদিত হয়, আর এক অর্থে তারও নাম রূপ। দ্বিতীয় অর্থে 'রূপ' পরবর্তীকালের বিশেষ করে ভিকটোরিয়া যুগের প্রয়োগ। বহিরঙ্গ অর্থে রূপ কবিব্যক্তিত্বনিরপেক্ষ। কবি যেমন করেই ভাবুন, অন্য আর এক কবি সেই একই বিষয়কে অন্যভাবে ভাবতে পারেন। কিন্তু দুই কবিরই কবিতার বহিরঙ্গ রূপ ভিন্ন না হতেও পারে। একই পয়ারের পদরূপে দুই কবি একই অথবা দুই বিষয়কে ধ্বনিত করে তুলতে পারেন। দুই ক্ষেত্রেই কবিতার বহিরঙ্গ রূপ একই। সে ক্ষেত্রে আমরা কবিব্যক্তির ভাবনার রূপটিকে ধরছি না। পরবর্তী ভিকটোরিয় যুগের সাহিত্যরসজ্ঞেরা এই ভাবনার উপরেই জোর দিলেন। তাঁরা দেখলেন, কবির ভাবনার ফর্মটি বোঝবার চেষ্টা না করলে সৃষ্টির অর্থ ঠিক বোঝা যায় না। বহিরঙ্গ ফর্মটি ছক মাত্র। এই ছক বা ছাঁচ টাইপ তৈরি করে দিতে পারে কিন্তু বিশেষ কবির বিশেষ ব্যক্তিমনটিকে ফুটিয়ে তোলে না। এই জন্যই তাঁরা বললেন স্টাইল ইজ দি ম্যান। এক-একজনের ভাবনার স্টাইল দিয়ে এক এক কবির মনের চেহারাটি পাওয়া যায় একে বুঝতে পারাই কাব্য উপভোগ করা। এই স্টাইলটাই কবিতার রূপ। বহিরঙ্গ দিক থেকে দুটি কবিতা এক হতে পারে, কিন্তু ভাবনার অন্তরঙ্গ রূপটি ভিন্ন হবেই যদি সৃষ্টি সার্থক হয়ে থাকে।

সাহিত্যে যখন থেকে 'ইমাজিনেশন' বা কল্পনাবৃত্তির উপর জোর এসে পড়ল, তখন থেকেই নিছক বিষয়বস্তুর গুরুত্ব কমে গেল। বিষয়টা নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর হতে পারে, তাকে অবলম্বন করে কবির কল্পনা বড় হয়ে উঠতে পারে, তাই কল্পনাকে কীভাবে পাঠকমনে সঞ্চারিত করা যাবে সেটা সম্পূর্ণ কবিরই দায়িত্ব। কোনো ব্যাকরণ বা শব্দ শাস্ত্র সেটা ছক বেঁধে বলে দিতে পারে না। কবি কেমন করে ভাবছেন, সেটা কবিই বুঝবেন এবং কেমন ভঙ্গিতে তাকে রূপ দেবেন সেটা

তাঁরই ভাবনা—পাঠক কবির অনুভূতির শরিক হতে পারলেই হল। কবি মনের এই বিশেষ ভাবনারূপের উৎস হচ্ছে ইনসপিরেশন—অনুপ্রেরণা। এই তত্ত্বটির জন্মও রোমান্টিক যুগে। ইনসপিরেশন-এর তো কোনো ফরমুলা দেওয়া যায় না। কখন কেমন করে কোন রূপ নিয়ে কবিতা আসবে, লেখার আগে কেউ ভবিষ্যদ্বাণী করে বলতে পারে না। বাতাস কখনও বন্ধুর মতো জড়িয়ে ধরে। কখনও তা প্রিয়ার আলিঙ্গনের মতো। কখনও নরম পালকের স্পর্শের মতো। এগুলি কবির ভাবনার এক একটা রূপ। একজন কবি শ্যামল সমারোহকে বলেছিলেন 'সবুজ অন্ধকার' আর একজন শস্যক্ষেত্রের উজ্জ্বল শ্যামলতাকে বলেছিলেন 'সবুজ আগুন'। এগুলি ভাবনার রূপ। ব্যাকরণ শাস্ত্র দিয়ে একে বোঝানো যায় না।

সাহিত্যের বহিরঙ্গ রূপের সঙ্গে অন্তরঙ্গ রূপের কি কোনো সম্পর্ক থাকল না? অথচ রোমান্টিক যুগের শেলি কীটস ব্রাউনিঙের আশ্চর্য সব কবিতা ছন্দ ও শব্দসঙ্গীতে যে ঐশ্বর্য লাভ করেছিল, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভিকটোরিয় যুগে তার একটা চূড়ান্ত রূপ দেখা গেল। একদিকে কাব্যের অন্তরঙ্গ রূপের প্রতি অধিকতর অভিনিবেশ, অন্যদিকে কাব্যের বহিরঙ্গ রূপের প্রতি সতর্ক মনোনিবেশ—একটা যেন প্যারাডক্সের সৃষ্টি করল। তারই বা ব্যাখ্যা কী? এই যুগের ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবটাই এসে পড়েছে রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর অনুবর্তী বিশ শতকের প্রথম দিকের কবিদের উপর। রবীন্দ্রনাথের উর্বশীর মতো কবিতার বহিরঙ্গ কাব্যরূপ এবং অন্তরঙ্গ কল্পনারূপ কোনোটাকেই খাটো করে দেখা সম্ভব নয়। 'উর্বশী'তে যে ভিকটোরিয় যুগের কবি সুইনবর্নের প্রভাব পড়েছিল, এটাও তো সমালোচকেরা স্বীকার করেছেন। বুদ্ধদেব বসুও বলেছেন, সুইনবর্নের প্রভাব তাঁরা পেয়েছেন।

বস্তুত ইংরেজি রোমান্টিক যুগ এবং বাংলায় রবীন্দ্রযুগে কবিতার রূপবন্ধে যে ঐশ্বর্য এসেছিল, এমন আর কোনো সময়েই আসেনি। এ সময়ের কবিতায় রস এবং সৌন্দর্যের আশ্চর্য বিকাশেরও তুলনা নেই। এ দুয়ের মিলনের সূত্রটা কোথায় সেটাই ভাববার কথা। কবি কীটসের এক একটি ওড-এর নিটোল রূপ তার কল্পনার নিটোলতার সঙ্গে এমনভাবে মিলে গেছে, যে ভাবলে বিস্ময় বোধ হয়। কবি যদি কবিতার ছন্দ মিল এবং অন্যান্য বহিরঙ্গ রূপ সৃষ্টির দিকে এত নিঁখুত মনোযোগ দেন, তবে ভাবের সহজ স্ফূর্ততা এবং অনুভূতির বিশিষ্ট রূপটি অক্ষুণ্ণ থাকে কি করে? এ প্রশ্নের উত্তর এ ভাবে দেওয়া যেতে পারে। কবি পূর্বার্জিত শব্দচেতনা ও রূপচেতনার উপরেই তাঁর বিশিষ্ট ভাবরূপটিকে অঙ্গে অঙ্গে মিলিয়ে দেন। সেখানে শব্দ প্রতীক ছন্দ ভাবরূপটিকে ধ্বনিত করে তুলতে সমর্থ হয়। রবীন্দ্রনাথ কবিতায় ছন্দের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গিয়ে এ কথাটাই ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন। বাইরের রূপ যদি অন্তরের রূপকে অতিক্রম করে যায় তবেই কবিতা হয় ব্যর্থ। তখন কবিতার শব্দ ও ছন্দ শুনতেই ভালো লাগে,,ভাবের রূপটি মনে ধরা দেয় না। 'তুমি নাহি চল কোনো সলজ্জিত বাসর-সজ্জাতে' এখানে

অনুপ্রাস বড় না ছবিটা বড়, পাঠকই বুঝতে পারবেন।

ভাবরূপ এবং প্রকাশরূপ এমনভাবে এক হয়ে যাওয়ার তুলনা কবিতার ক্ষেত্রে তত সহজসাধ্য নয়। সাহিত্যরূপ বলতে রবীন্দ্রনাথ যা বুঝিয়েছিলেন, তা এটাই। এই দুই রূপ মিলে যাওয়াই পরিপূর্ণতা। নাটক উপন্যাস গল্পের ক্ষেত্রেও এমনি করেই পরিপূর্ণতাকে পেতে হবে। শেক্সপীয়রের নাটককে তো সাহিত্যের সর্বোত্তম সাফল্যই বলা হয়ে থাকে। তাতেও সংলাপ ও ক্রিয়া-সন্নিবেশ দ্বারা একটা যে পূর্ণ ছবি পাওয়া যায় সেটা নাট্যকার শেক্সপীয়রেরই ভাবনারূপ। তিনি এমনি করেই জগৎ ও জীবনকে অনুভব করেছিলেন। সেই অনুভবকেই রূপময় করে তুলবার জন্য ঘটনাক্রিয়াকে অঙ্কে দৃশ্যে ভাগ করে ছবিটি সম্পূর্ণ করেছেন। সেই সময় সাহিত্য সমালোচনায় রূপতত্ত্ব এমন করে বিশ্লেষিত হয়নি। তবু সাহিত্য বিশ্লেষণের বিবর্তন ধারায় আভ্যন্তরীণ এবং বহিরঙ্গ রূপের এই সমন্বয় সমালোচকদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উপন্যাস ছোট গল্পের ক্ষেত্রেও একইভাবে এই তত্ত্বটির প্রয়োগ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণে'র মতো গল্পে যেমন, তারাশঙ্করের 'জলসাঘর' গল্পেও তেমনি লেখকের কল্পনার রূপ আর কাহিনীর রূপ এমনি করেই মিলে যায়।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, বহিরঙ্গ রূপের এমন যে নিটোল বাঁধুনি এবং অনিবার্যতা, তার প্রয়োজনীয়তাও হ্রাস পেয়ে এল। পরে কবিতায় ছন্দ ও মিলের শৃঙ্খলা হারিয়ে যেতে লাগল, তাতে কি আমরা সাহিত্যের আদর্শের শ্রেষ্ঠতা থেকে ভ্রষ্ট হচ্ছি? শিল্পরূপের এমন ঐশ্বর্য হাতে পেয়েও আমরা ধরে রাখতে পারছি না কেন? ছন্দকে কৃত্রিম মনে হচ্ছে, ভাষাকেও অতিপ্রসাধিতা বলে বদলে নিচ্ছি ফলে একালের সাহিত্যের চেহারা বদলে যাচ্ছে। উনিশ শতকের সাহিত্যের সঙ্গে বিশ শতকের সাহিত্যের প্রায় যেন জাতিগত বিভেদ ঘটে গিয়েছে। এই যে গদ্যছন্দ— এ কি কবির ভাবনা রূপের প্রতিফলন? এখানেও কি ভাবরূপ ও রচনারূপের একাত্মতা ঘটছে? আমরা এখনও বলি, যে-সৌন্দর্যের জগতে রোমান্টিক কবিরা বাস করতেন, সেই জগৎ থেকে আজকের কবিরা বেরিয়ে এসেছেন। এখন জগতের বাস্তব চেহারাটা কোনো কাল্পনিক জগৎ তৈরি করে তুলতে দেয় না। তাই কবিতা বলতে আগে আমরা যাকে বুঝতাম, তার ভাষা হারিয়ে গেছে।

আমাদের আলোচ্য কিন্তু এই পরিবর্তনের কারণ নির্ণয় করা নয়। রূপ শব্দটি সাহিত্যালোচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অর্থ বহন করে। সেসব আমরা যথাসম্ভব দেখেছি। কিন্তু রূপের যে সংজ্ঞার প্রাথমিক সম্বল নিয়ে শিক্ষার্থীরা এক সময়ে সাহিত্যের শিক্ষা আরম্ভ করত, আজ তা আর অনড় নয়। এখন জানতে দিতে হবে যে, কবিতায় আর গদ্যে বিরোধ থাকবে না। গদ্য কবিতা হয়ে উঠতে পারে তেমনি কবিতাও গদ্য হয়ে উঠতে পারে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত গদ্য পদ্যের বিরোধ দূর করবার কথা বলেছিলেন। তিনি বস্তুত একালের একটা প্রবণতার কথাই বলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর লিপিকার রচনাগুলিতে এই বিরোধ ঘোচাতে গিয়েছিলেন কিন্তু

গদ্য বলতে যা বুঝি, লিপিকার ভাবনাতে তা ছিল না। দৈনন্দিন জীবনের ক্লিন্ন রুক্ষতা, তার রূঢ় কর্কশতা, জীবনের তথ্যকে তথ্য হিসাবে দেখা লিপিকায় নেই। তাই তার রচনা কবিতারই মতো, যদিও ছন্দ ও পঙক্তির শৃঙ্খলা না থাকায় তা প্রচলিত গদ্যেরই রূপ নিয়েছে। আবার রবীন্দ্রনাথের পরের কবিদের হাতে কর্কশ গদ্য বক্তব্যই মিলহীন ছন্দহীন কবিতায় রূপান্তরিত হয়েছে। অনেকেই হয়তো এদের কবিতা বলতে চাইবেন না, কিন্তু বহু ব্যাখ্যায় ও যুক্তিতে গদ্য কবিতাও কবিতা বলে স্বীকার্য হয়েছে।

শুধু কি কবিতার ক্ষেত্রেই সংজ্ঞার ভিত্তি টলে গিয়েছে? গদ্য যে বহুরূপচারী। তার ক্ষেত্রেও রূপের সীমানা হারিয়ে ফেলার উপক্রম হয়েছে। যদি মিল আর পঙক্তি বিন্যাসকে কাব্যের লক্ষণ বলে মেনে না নেওয়া যায়, তবে অনেক গল্পেই কবিতার উপস্থিতি টের পাওয়া যাবে। এক সময়ে রবীন্দ্রনাথের গল্পকে গীতিকাব্যধর্মী বলা হত। রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতায় ছোটগল্পের যে-সংজ্ঞা দিয়েছিলেন, সেই সংজ্ঞা গীতিকাব্যের ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য। সমালোচক ঘোষণা করেছেন, আকৃতিটাই ছোটগল্পের সর্বস্ব নয়। বিশ শতকের নাটক নানা রূপ অর্জন করেছে। ক্ল্যাসিকাল নাট্যরূপের দৃঢ় নিয়মরীতিগুলি ভেঙে পড়ছে। আপাতদৃষ্টিতে নাট্যরূপ থাকলেও তাতে প্রবন্ধের বক্তব্যধর্মিতা, উপন্যাসের বিবরণধর্ম, কবিতার ব্যঞ্জনাধর্ম সব মিশে এক নতুন নাট্যরূপ গড়ে তুলছে।

গদ্যের আদর্শ দৃষ্টান্তস্থল হচ্ছে প্রবন্ধ। প্রবন্ধ যে কত রূপ নিয়ে কতভাবে মানুষের সৃজনশক্তির প্রকাশ ঘটাচ্ছে তার হিসাব করা কঠিন। গদ্যের অসাধারণ ক্ষমতা হচ্ছে, মানুষের সব রকমের অভিজ্ঞতা ও অনুভতিকে তা প্রকাশ করতে পারে। গদ্যকে ভাবা হত নিছক প্রবন্ধের প্রকাশরূপ এবং তাতে বিচার, বিশ্লেষণ, তত্ত্বসন্ধান—মননের এইসব দিকগুলি থাকবে। এই দিকগুলিকে মানুষের সৃষ্টিক্ষমতার পরিচয় হিসাবে স্বীকার করা হত না। এই ছুৎমার্গ পরিহার করাই উচিত কারণ প্রবন্ধ বুদ্ধি বিচারের ফসল হলেও নতুন সিদ্ধান্ত বা তত্ত্বকে গড়ে তুলতে পারে বলে প্রবন্ধকেও ক্রিয়েটিভ বলতে আপত্তি থাকা উচিত নয়। বহু ক্ষেত্রেই বিশ্লেষণ ও বিচারের সঙ্গে কল্পনা জড়িয়ে থাকে। এমনি করে গদ্য প্রবন্ধ থেকে রম্যরচনার সৃষ্টি। প্রবন্ধ এবং রম্যরচনার রূপ আলাদা। রম্যরচনার মধ্যে গল্প আসতে পারে, আবার গল্পও রম্যরচনা হয়ে উঠতে পারে—এ তো আমরা সব সময়েই দেখি। রম্যরচনায় কবিতার লক্ষণ থাকে—এ কথাও সমালোচকরা বলে থাকেন।

আজকাল আমাদের বাংলা সাহিত্যে একটা নতুন জিনিস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সমাজবাস্তবতা সাহিত্যে এসেই থাকে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাস্তবকে আঁকাই উপন্যাসের মুখ্য লক্ষণ বলেছিলেন। উপন্যাসকার আমাদের দৃশ্য জগতের বাস্তবকে নিয়ে উপন্যাসে আর এক বাস্তবজগৎ তৈরি করেন। কিন্তু উপন্যাসের বাস্তবতার সঙ্গে লৌকিক বাস্তবতার দায়বদ্ধতা নেই। টমাস হার্ডি তাঁর উপন্যাসে

যে বাস্তবকে এঁকেছেন, তার সঙ্গে জেমস জয়েসের বাস্তবতার মিল নেই। ডিকেন্স এবং থ্যাকারে লণ্ডন শহরের বাস্তবতাকে উপন্যাসে এঁকেছেন তার কতটুকু তাঁর নিজস্ব ভাবনার প্রয়োজনে, সেই আলোচনার মধ্যে না গিয়েও এটা তো বলতে পারি যে জয়েশের বাস্তবতার চেহারাই অন্য রকমের। বাংলায় অন্নদাশঙ্করের 'রত্ন ও শ্রীমতী' উপন্যাসের কাহিনীতে বাস্তবতার ভিত্তি আছে—সেও পরকীয় প্রেমেরই কাহিনী তার সঙ্গে সমরেশ বসুর উপন্যাসের বাস্তবতার কোনো মিলই খুঁজে পাওয়া যাবে না। সুতরাং বাস্তব উপন্যাসের অবলম্বন হলেও লেখকের ভাবনাই তাকে বিশিষ্ট রূপ দেয়।

সমরেশ বসু মৃত্যুর কিছুকাল আগে শিল্পী রামকিংকর বেইজকে নিয়ে উপন্যাস লেখায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ইদানীং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লিখেছেন 'প্রথম আলো'। রামকিংকর এবং রবীন্দ্রনাথ দু'জনেই বাস্তব ব্যক্তি। এরকম অসাধারণ ব্যক্তি নিয়ে প্রথাসম্মত জীবনী লেখা হয়ে থাকে। জীবনী বস্তুটাই খানিকটা ইতিহাসজাতীয়, তাতে কাল্পনিক তথ্যের স্থান নেই, যদিও যুক্তিসঙ্গত অনুমানের স্থান আছে। এই জীবনীকে যখন উপন্যাসের রূপ দেওয়া হয়, তখন সেই পুরনো তর্কই কি উঠবে না—কাব্যে সত্যের স্থান কতখানি? রামকিংকর ও রবীন্দ্রনাথ আমাদের খুব কাছের মানুষ। তাঁদের জীবনের ঘটনাগুলি বদলানোর উপায় নেই। সে-বিষয়ে অবশ্য সমরেশ বসু এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় দুজনেই যথেষ্ট তৈরি হয়ে নিয়েছেন তথ্য সংগ্রহ করে। কিন্তু সাহিত্যিক যখন এঁদের জীবনকে সাহিত্যে রূপ দিতে যান, তখন অনেক ঘটনার পিছনেই মানসিক ভাবগত অনুপ্রেরণাটি কল্পনা অথবা ব্যাখ্যা করে নিতে হয়। সেখানেই উপন্যাসকারের সৃষ্টি এবং দায়িত্ব। জীবনীর উপন্যাসে রূপান্তরিত হওয়ার সাফল্য সেখানেই। আবার এটাও দেখা গেছে তথ্য রক্ষার প্রয়োজনে কখনও এই উপন্যাসকেও বর্ণনায় ও বিশ্লেষণে প্রবন্ধধর্মী হয়ে উঠতে হয়েছে। সব মিলিয়ে উপন্যাসের মধ্যে জীবনীর সংক্রমণ নতুন সাহিত্যরূপ গড়ে তুলছে।